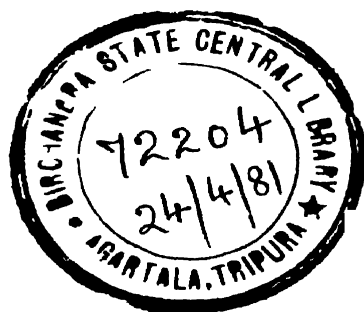
সঙ্গীতদর্শিকা

দ্বিতীয় খণ্ড



শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, বেঙ্গল মিউজিক কলেজ (কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় ও লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ সংযুক্ত)
রেক্টর, আর্য্যসঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা।
পরিচালক কণ্ঠসংগীত বিভাগ—ভাতখণ্ডে
সংগীত বিদ্যাপীঠ, লক্ষ্ণৌ।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত ও চারুকলা
বিভাগের ডীন (প্রাঃ)

চতুর্থ সংস্করণ
১২ই আশ্বিন
১৩৬৬ সাল।

প্রকাশক
শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়
বি. এ. সংগীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
বাদ্য বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)
রামকৃষ্ণ আশ্রম, যাদবপুর
মূল্য : বারো টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীমনোমোহন পাল
বাসুদেব প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১নং বিধান সরণি
কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

একদা যাঁহার সাহচর্যে আমার সঙ্গীত-জীবনের যাত্রা সুরু হয় সেই স্নেহময় অগ্রজ স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ভূমিকা ॥

সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ তাঁর "সঙ্গীতদর্শিকা" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশের বিচিত্র গীতধারা ও গীতরীতির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত ভারতীয় সঙ্গীতের শিল্পীদের জীবনকথা সমাবেশ করেছেন সহজ ও সুন্দরভাবে। 'সঙ্গীতদর্শিকা'র প্রথম ভাগ এরই আগে সঙ্গীত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু মূল্যবান। বিচক্ষণ গ্রন্থকার সরল ভাষায় মঙ্গলগীত, চর্যাগান, কৃষ্ণকীর্তন, নামকীর্তন, পদাবলী-কীর্তন, বাউল, পাঁচালী, নাচাড়ি, দাঁড়াকবি, বৈঠকীগান, কথকতা, যাত্রাগান প্রভৃতি অভিজাত ও দেশী তথা লোকগীতির পরিচয় দিয়েছেন যেগুলি বাংলাদেশের সঙ্গীতশিল্পসংস্কৃতির জগতে অমূল্য। এই সকল গীতির রূপভেদ ও রীতির পরিচয়দান ছাড়া তিনি প্রাচীন প্রখ্যাত পদকর্তা, গীতিশিল্পী ও সঙ্গীত-শাস্ত্রীদের জীবনকাহিনী তাঁর গ্রন্থের অঙ্গীভূত করেছেন। সঙ্গীতের ঐতিহাসিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি অপরিহার্য। গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, শ্রীচৈতন্য, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি দত্তিল, শার্ঙ্গদেব, কল্লিনাথ, পণ্ডিত অহোবল, সোমনাথ, দামোদর, রাজা মানসিংহ, স্বামী হরিদাস, মিঞা তানসেন, আমীর খস্রৌ, সদারঙ্গ, নিয়ামৎ খাঁ, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক সাধক-কবি, সঙ্গীতশাস্ত্রী ও শিল্পীদের জীবনকাহিনী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গীতরীতি এবং ধারারও তিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হোলেও উপাদানে সমৃদ্ধ।

ভারতীয় গীতশ্রেণীর অন্যতম সম্পদ বাংলাগানের নিজস্ব একটি রূপ ও প্রকাশভঙ্গি আছে। বাংলাদেশের শ্যামল সুন্দর পরিবেশ ও

সরস প্রকৃতিকে নিয়েই শুধু সঙ্গীত কেন, বাংলার সাহিত্য, কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং ধর্মও গড়ে উঠেছে। বাংলার সমাজপরিবেশ বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির মর্মকথাই প্রকাশ করে। বাংলার গান, তাল ও নৃত্যের মধ্যেও একটি বিশেষ রীতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাংলার শাক্তপদাবলী, সাধনসঙ্গীত, পদাবলীকীর্তন ও বিচিত্র তালের ভঙ্গি ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে এক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন বাংলায় ও বিশেষ কোরে গুপ্ত ও পাল যুগে দেবমন্দিরগুলি সঙ্গীতশিক্ষা সাধনার পীঠস্থান হিসাবে গণ্য ছিল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কাশ্মিরী ঐতিহাসিক কহ্লন রাজতরঙ্গিনীতে নাকি এ'সবের উল্লেখ করেছেন।

বাংলার পালগীতি ও নাথগীতিকার লক্ষ্য ও সার্থকতা সামান্য ভিন্ন হোলেও লোকশিল্পসংস্কৃতিরই তারা অঙ্গ। নাথগুরুদের সাধনগীতি তথা গোরক্ষবিজয়, মীনচেতন, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, গোপীচাঁদের পাঁচালী প্রভৃতি নাথগীতির নিদর্শন। লোকগীতি অধ্যাত্ম পথের দিশারী।

খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতকের বজ্রযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চর্যা এবং বজ্রগানও অধ্যাত্মসাধনা ও প্রেরণার সচল উৎস রূপে গণ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতকের 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থে মঙ্গল, ধবল, রাগড়ী প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে চর্যাকেও প্রবন্ধশ্রেণীর গান হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের গোড়ার দিকে গীতগোবিন্দের পদগান ছিল প্রবন্ধগীতি। গীতগোবিন্দে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সমাবেশ ছিল। শাস্ত্রীয় নৃত্যও ছিল তার অঙ্গ। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত নামকীর্তন, ঠাকুর নরোত্তমপ্রবর্তিত লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন, পরবর্তী পাঁচালীর ভঙ্গিতে মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের ঢপকীর্ত্তন, তখনকার সমাজে রামায়ণগান, চণ্ডীর গান, কালীকীর্ত্তন, মনসার গান, এবং তাছাড়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্ত সাধকদের শ্যামাসঙ্গীত, রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর

বাংলা টপ্পাগান, রাম বসুর কবিগান, দাশরথি রায়ের পাঁচালী এবং আরো কত শত রকমের গান বাংলার সমাজে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালীর দুর্গামণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপ ছিল তখন আনন্দ-সমারোহের কেন্দ্র। পল্লীসংগঠন, ধর্মালোচনা, বিতর্কন্থ'ন প্রভৃতি ছাড়াও আমোদপ্রমোদের প্রাণকেন্দ্র রূপে ঐ সব চণ্ডীমণ্ডপের হোত ব্যবহার।

বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র লোকগীতের হয়েছিল বিকাশ। সমাজ-মনে তাদের প্রভাবও ছিল কম নয়। এক কথায় বাংলার প্রাত্যহিক জীবনধারা ছিল ওতঃ-প্রোতভাবে জড়িত বিচিত্র নৃত্য, গীত ও বাদ্য তথা আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে। কুমারীদের ভাদুবন্দনা ও ভাদুগান, টুসুগান, বিভিন্ন ব্রতোৎসব ছড়ার আকারে সহজ সরল গান ও ছন্দায়িত নৃত্য, ঝুমুরগান, ভাঁজোগান, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, জারি, সারি, বাউলগান বাংলার স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছন্দ জীবনের নিদর্শন।

তবে ভারতের সকল দেশের লোকগীতির রূপ, বিকাশভঙ্গি ও প্রকৃতি প্রায় একই ধরণের। লোকগীতি বা পল্লীগীতির রূপকে আশ্রয় কোরেই ক্রমবিকাশের পথে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল গীতি-রূপের বিকাশ হয়েছিল। চিরদিন অনুন্নত থেকেই উন্নত রূপের হয় বিকাশ এবং এই বিকাশ ও বিস্তৃতির মধ্যে থাকে অসংখ্য ভাঙ্গা-গড়ার নিত্য নূতন রূপ ও বিবর্তনের ধারা। সুপ্রাচীন আদিম অনুর্বর গীতিই প্রাগৈতিহাসিক যুগ অতিক্রম কোরে বৈদিক যুগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নূতনত্তার মিশ্রণ, উদ্‌ভাবন ও পরিবর্দ্ধন হয়েছিল তাতে যথেষ্ট। বৈদিকের পর এলো গান্ধর্বগানের যুগ। গান্ধর্বগানকেই বলা হোত মার্গসঙ্গীত। এই গান্ধর্ব বা মার্গগীতি-শ্রেণীর অনুশীলন বিলুপ্ত হোল ভরতোত্তর যুগে আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ৫ম-৭ম শতকে। এই ৫ম-৭ম শতকেই আবির্ভূত হন সঙ্গীতশাস্ত্রী মতঙ্গ। মতঙ্গের আগেও কোহল, যাষ্টিক, তুম্বরু, বিশ্বাবসু, দুর্গা-

শক্তি প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রীরা জীবিত ছিলেন। ছাপার আকারে তাঁদের গ্রন্থ না পাওয়া গেলেও বৃহদ্দেশী, সঙ্গীতসময়সার, সঙ্গীত-রত্নাকর এবং সিংহভূপালকৃত রত্নাকরের "সুধাকর" ও কল্লিনাথকৃত "কলানিধি" টীকা প্রভৃতিতে তাঁদের যে সকল প্রমাণবাক্যের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তা থেকে জানা যায় অভিজাত দেশীরাগ বা রাগগীতির বিকাশ হয়েছিল ঠিক ভরতের পরবর্তীকালেই। অবশ্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে মগধদেশজাত মাগধী, অর্ধমাগধী গীতরীতির উল্লেখ আছে এবং এ'দুটি গীতি অভিজাত ধ্রুবা-নাট্যগীতির অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হোত। ধ্রুবাগান ছিল গান্ধর্ব বা মার্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নাটকপ্রসঙ্গেই ছিল তার ব্যবহার। ক্রমে গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীতের অনুশীলন লোপ পেল এবং প্রচলিত হোল পরিশুদ্ধ দেশীসঙ্গীতের রূপ। আধুনিক সমাজে যে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল গানের ও রাগের আমরা অনুশীলন করি এরা অভিজাত দেশীসঙ্গীতের শ্রেণী-ভুক্ত, মার্গসঙ্গীত মোটেই নয়। তবে একথাও আবার সত্য যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে রাগে, তালে ও গীতিরূপে পরিবর্তন এলেও ঐতিহ্যবাহী এক আদর্শের অন্তর্নিবেশ আছে সকল শ্রেণীর মধ্যে আর তারি জন্য প্রতিটি রাগের ধ্যান ও মন্ত্র-রূপে বর্ণনাভেদ দেখা দিলেও সকলের মধ্যে আদর্শগত এক অখণ্ড আদর্শের ভাব স্পষ্ট দেখা যায়।

পরিশেষে একথা স্বীকার্য যে সঙ্গীতকার তথা কবি ও গীতি-কারদের জীবনালেখ্যের সমাবেশ সঙ্গীত-ইতিহাসের এক অপরিহার্য উপাদান। ইতিহাসবাহী গীতিধারার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিচিত্র গায়নশৈলী ভাবমাধুর্য ও অলংকরণগীতি প্রভৃতিও সঙ্গীতশিল্পীদের জীবন উপাদানের সহচারী হোয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাতে কোরে বিভিন্ন যুগের গীতি ও রাগরূপ জিজ্ঞাসু ও শিক্ষাসেবিদের কাছে পূর্ণরূপ নিয়ে ধরা দেয়। বিচিত্র কালের দর্পণে পরিপূর্ণ সাঙ্গী-তিক মূর্তিকে চিনে নেওয়ার তাঁরা সুযোগ পান। তবে একথা সত্য যে বিভিন্ন যুগের সঙ্গীতসাধক, শাস্ত্রী ও শিল্পীদের আবির্ভাব ও তিরো-

ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণপঞ্জীর অভাবে অনেক সময় নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হয়, কল্পনা এসে বাস্তবকে ম্লান করে যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আদরণীয় নয়। বর্তমান গ্রন্থেও হয়তো অসাবধানতার জন্য কিছু কিছু কোথাও কোথাও সন তারিখে ও ঘটনার সমাবেশে বিচ্যুতি দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাহলেও গ্রন্থকার বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সকল বিষয়গুলির আলোচনা করেছেন।

পরিশেষে সঙ্গীতজ্ঞানী শ্রীনলীগোপাল বাবুকে আমরা অন্তরের অভিনন্দন জানাই তাঁর সময়োচিত এই প্রচেষ্টার জন্য। সঙ্গীতের ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক সাধনা ও শাস্ত্র উভয় দিকেই জ্ঞান তাঁর প্রশংসনীয়। সঙ্গীতের বিস্তার ও সংগঠন-ক্ষেত্রেও দান তাঁর অপরিসীম। তাই এই গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশ প্রচেষ্টা তাঁর সার্থক হোক সঙ্গীতগুণী ও সঙ্গীতসেবীদের কাছে সমাদর লাভ কোরে।

শ্রীরামকৃষ্ণবেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

PADMABHUSHAN
DR. S. N. RATANJANKAR
B. A., D. MUS.
(Fellow, Sangeet Natak Akademi,
New Delhi)

10-A, Hill View,
Raghavji Road,
P. O. Cumball Hill,
Bombay-26 (WB)

'Sangeet Darshika' is a book full of useful information on music that every student of Hindustani Classical Music must possess. Besides information on important topics of the theory of music and rules of the Ragas of the higher stages of study, the author, Shri N. G. Banerjee, has also given the life sketches of important Musicologists and Musicians of the past and present ages which have made the book interesting and informative. A chapter on the music of Bengal added more to the utility of the book.

Every Institution of music must have this book in its library.

I wish all success to the author.

Calcutta

Sd/- Ratanjankar S. N.

গ্রন্থকারের নিবেদন

অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গীতদর্শিকা দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এই খণ্ডে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তৎসমুদয়ই গ্রন্থের ভূমিকাতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে সুতরাং এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন বোধ করিলাম না। তবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে সামগ্রিক ভাবে সঙ্গীতের উপাধি পরীক্ষায় শিক্ষণীয় সকল বিষয়েরই যথাসম্ভব আলোচনা ইহাতে আছে এবং গ্রন্থখানি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বি, মিউজ, থ্রি ইয়ার্স্ ডিগ্রি কোর্স্, সঙ্গীত বিশারদ ও অনান্য উপাধি পরীক্ষার্থীদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে বলিয়াই আমি আশা করি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থখানি উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিক্‌পাল সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ সঙ্গীতদর্শিকা দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের শ্রী ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নিবিড় স্নেহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া নিকটতর করিয়াছেন এবং চতুর্থ সংস্করণেও তঁাহার পুর্ব্বোক্ত ভূমিকাটি সংযোজিত হইল। এই ত্যাগী মহান্ সন্ন্যাসীর নিঃস্বার্থ স্নেহ আমার জীবনে সর্বদাই প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে এই বিশ্বাস আমি রাখি।

সঙ্গীতদর্শিকা দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে—

খয়রাগড় ইন্দিরা কলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, পদ্মভূষণ ডঃ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকর মহোদয়ের অভিমত কৃতজ্ঞতার সহিত এই সংস্করণেও সংযোজিত হইল। পুর্ববর্তী

সংস্করণের জীবনীগুলির সহিত বর্তমান সংস্করণে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী সন্নিবেশিত করা হইল।

সংগীত ও দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কান্তকবি রজনীকান্ত সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এক জায়গায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "বাংলাদেশে ভক্তি সাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে, বহুকালের প্রাচীন এই ধারা। এই ভক্তিসাধনার প্রকৃতি হইতেছে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পিতপ্রাণ ভক্তকে ভগবানের অপার করুণা রক্ষা করে, দুর্গম পথে চালনা করে এবং শেষ পর্যন্ত চরম সার্থকতায় পৌঁছাইয়া দেয়। প্রধানতঃ সংগীতে ভক্ত আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। সংগীত এখানে মন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই ভক্তি সাধনার সমান্তরালে একটি সংগীতের প্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, বাউল ও অন্যান্য লোকসংগীত সমস্তই এই ধারার অন্তর্গত। ব্রাহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংগীতকেও এই ধারার অন্যতম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

কাজেই এই সংগীত ও সাধনা, সংগীত ও দর্শন পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তারও একটা তুলনামূলক আলোচনা দরকার। হয়ত বিভিন্ন পুস্তকে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মহামানব শ্রীঅমিয় মাধব রায়চৌধুরী, যিনি আধ্যাত্মিক জগতে "দাদাজী" বলে খ্যাত তার নব চিন্তাধারার সঙ্গে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন কবি, দার্শনিক ও সংগীতজ্ঞের চিন্তাধারার অপূর্ব মিলনের রূপ একটি আলোচনামূলক প্রবন্ধে প্রকাশ করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত-বিদ্বান ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থোক্ত কোন কোন বিষয়ে আমাকে যথাযোগ্য উপদেশ দানে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বাংলার লোক-সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও গীতকার শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সঙ্গীতদর্শিকার দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে আশাতীত রূপে সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম। প্রশস্তিবাদ দ্বারা তাঁহার ঔদার্য্যকে খর্ব করিতে চাহিনা।

এই গ্রন্থ প্রণয়ণে আমার বিশিষ্ট বন্ধু স্বর্গীয় অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় নানা বিষয়ে আমাকে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থটির এই নূতন সংস্করণ পরিবর্ধনে আমার বিশিষ্ট বন্ধু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ ননীলাল সেন মহাশয় এবং বন্ধুবর সংগীতরসিক এ্যাটর্নী শ্রীমধুসূদন দে এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী স্নেহভাজন শ্রীমান অরবিন্দ বিশ্বাস নানারূপ ভাবে সহযোগিতা করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে স্নেহভাজন সঙ্গীত বিশারদ শ্রীমান পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, সঃ বিঃ শ্রীমতী নিয়তি সান্যাল এই গ্রন্থের কার্য্যে নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমার ঐকান্তিক আশীর্বাদ জানাই।

প্রিয় সুহৃদ হরিপদ দাস এই পুস্তিকার প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য তিনিও ধন্যবাদার্হ।

কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে এই গ্রন্থ সঙ্কলনে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে-রচিত কতিপয় গ্রন্থ, পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ লিখিত "হমারে সঙ্গীত রত্ন", কুমার বীরেন্দ্রকিশোর লিখিত "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান", শ্রীজয়দেব রায়

লিখিত "সঙ্গীত-পরিক্রমা" ও অপরাপর বহু সঙ্গীত গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

গ্রন্থখানিতে মুদ্রণজনিত বা তদতিরিক্ত ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে; সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা আমাকে অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করিলে বাধিত হইব এবং ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইব। সঙ্গীতদর্শিকা দ্বিতীয় খণ্ডও প্রথম খণ্ডের ন্যায় জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগের উপকারে আসিলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

রামকৃষ্ণ আশ্রম
যাদবপুর, কলিকাতা-৭৫

বিনীত—
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র



সংগীতদর্শিকা

প্রথম অধ্যায়

"শ্রুতি ও স্বরস্থান"

এতদ্দেশীয় প্রাচীন সংগীতবিদ্‌গণ সংগীত শাস্ত্র লিখিবার সময় প্রথমতঃ শ্রুতি এবং স্বরের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া তৎপর ঠাট এবং রাগের বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রণীত সমস্ত গ্রন্থেই এই রীতি দেখা যায়। আমাদিগকে এখন দেখিতে হইবে যে প্রাচীন গ্রন্থকারের শ্রুতি ও স্বরস্থান কিরূপ ছিল এবং আজকালই বা উহার ব্যবহার কিরূপ হইয়া থাকে। শ্রুতি ও স্বরস্থান বিষয়ে যে সব পণ্ডিতদের মতামত বিচার করিতে হইবে তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্রন্থকারের নাম—	গ্রন্থের নাম—
(১) ভরত	নাট্যশাস্ত্র
(২) শার্ঙ্গদেব	সংগীতরত্নাকর
(৩) লোচন	রাগতরঙ্গিনী
(৪) অহোবল	সংগীতপারিজাত
(৫) হৃদয়নারায়ণদেব	হৃদয়প্রকাশ
(৬) শ্রীনিবাস	রাগতত্ত্ববিবোধ

ইহাদের সহিত পণ্ডিত ভাতখণ্ডে-রচিত "লক্ষণ-সংগীত" এবং "অভিনবরাগমঞ্জরী" নামে অভিহিত হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতির প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের বিচার করিতে হইবে।

ভরত ও শার্ঙ্গদেব অতি প্রাচীন এবং লোচন, অহোবল, হৃদয়-নারায়ণদেব ও শ্রীনিবাসকে মধ্যকালের গ্রন্থকার বলিয়া মানা হয়।

লক্ষণসংগীত এবং অভিনবরাগমঞ্জরী এই গ্রন্থদ্বয়ে বর্ত্তমান সংগীত পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। ভরতের সময় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে, শার্ঙ্গদেবের সময় ত্রয়োদশ শতাব্দী, লোচনের সময় পঞ্চদশ শতাব্দী, অহোবলের সময় ষোড়শ শতাব্দী, হৃদয়নারায়ণের সময় সপ্তদশ শতাব্দী এবং শ্রীনিবাসের সময় অষ্টাদশ শতাব্দী বলিয়া মানা হয়।

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ শ্রুতি সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "শ্রূয়তে ইতি শ্রুতিঃ"। সংগীত উপযোগী যে নাদ স্পষ্ট শ্রুতি-গোচর হয় তাহাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতিসংখ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্ত্তমান গ্রন্থকারগণ একমত। "সা" হইতে তার "সা" পর্য্যন্ত সংগীতোপযোগী ২২টী নাদ বা শ্রুতি মানা হইয়াছে।

উপরোক্ত নাদের উপর সংগীতোপযোগী শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। সাতটী শুদ্ধ স্বরের উপর নিম্নলিখিত শ্রুতি মানা হইয়াছে।

'চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রি ঋষভধৈবতৌ ॥"

অর্থাৎ ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটী স্বরের চারটী করিয়া, নিষাদ এবং গান্ধারের দুইটী করিয়া ঋষভ এবং ধৈবতের তিনটী করিয়া শ্রুতি মানা হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর প্রাচীনকালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কারণ প্রাচীনকালে শুদ্ধস্বর সমূহ অন্তিম শ্রুতির উপর স্থাপন করা হইত। বর্ত্তমানে প্রথম শ্রুতির উপর শুদ্ধস্বর স্থাপন করা হয়।

শ্রুতি নং	শ্রুতির নাম	প্রাচীনকাল	বর্ত্তমানকাল
১	তীব্রা	—	ষড়জ
২	কুমদ্বতী	—	—
৩	মন্দা	—	—
৪	ছন্দোবতী	ষড়জ	—
৫	দয়াবতী	—	ঋষভ
৬	রঞ্জনী	—	—
৭	রক্তিকা	ঋষভ	—
৮	রৌদ্রী	—	গান্ধার
৯	ক্রোধী	গান্ধার	—
১০	বজ্রিকা	—	মধ্যম
১১	প্রসারিণী	—	—
১২	প্রীতি	—	—
১৩	মার্জনী	মধ্যম	—
১৪	ক্ষিতি	—	পঞ্চম
১৫	রক্তিকা	—	—
১৬	সন্দিপিনী	—	—
১৭	আলাপিনী	পঞ্চম	—
১৮	মদন্তী	—	ধৈবত
১৯	রোহিণী	—	—
২০	রম্যা	ধৈবত	—
২১	উগ্রা	—	নিষাদ
২২	ক্ষোভিণী	নিষাদ	—

শ্রুতি এবং স্বরস্থানকে ধ্বনির দৃষ্টিতে বিচার করিবার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে অতি প্রাচীন গ্রন্থকারদ্বয় ভরত এবং শার্ঙ্গদেব, দ্বিতীয় ভাগে মধ্যকালীন গ্রন্থকারগণ লোচন, অহোবল, হৃদয়নারায়ণদেব ও শ্রীনিবাস। তন্মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ২২টী শ্রুতি সমদূরত্বে অবস্থিত বলিয়া মানিতেন। তাঁহাদের শ্রুতি ও স্বরস্থান আমাদের সংগীতোপযোগী নহে। মধ্যকালীন গ্রন্থকারদের লিখিত শ্রুতি ও স্বরস্থানের সহিতই বর্ত্তমানের শ্রুতি ও স্বরস্থানের বিচার করা বিধেয়।

লোচন, অহোবল প্রভৃতি পণ্ডিতদের সময় পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী মানা হইয়াছে। উপরোক্ত পণ্ডিতগণ প্রধান ১২টী স্বরের সাহায্যে তাহাদের পদ্ধতি বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত শ্রুতি সমান বলিয়া মানিতেন না। তাঁহারা পরম্পরাগত নিয়মানুযায়ী ১২টী স্বর মানিয়া লইয়া শাস্ত্রোক্ত সংখ্যানুযায়ী শ্রুতি বিভাজন করিতেন। পণ্ডিত ভাবভট্ট-রচিত "অনুপ-বিলাস" গ্রন্থে দেখা যায় যে গ্রন্থকার সমস্ত শ্রুতি সমদূরত্ব বলিয়া মানিতেন না। লোচন, অহোবল ও শ্রীনিবাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের শ্রুতি ও স্বরস্থান সম্বন্ধে বিচার একই প্রকারের; অতএব শ্রীনিবাসের স্বরস্থান—বিচার আলোচনা করিলেই চলিবে।

আধুনিক সংগীতের প্রতিনিধি হিসাবে "অভিনবরাগমঞ্জরী" গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে মানিয়া লওয়া যায়।

ধ্বনির দৃষ্টিতে শ্রুতি স্বরস্থান নির্ণয়ের দুইটী প্রচলিত প্রণালী আছে।

(১) বীণার তারের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্বরস্থান নির্ণয় করা।

(২) ধ্বনির প্রতি সেকেণ্ডে তুলনাত্মক আন্দোলনের সাহায্যে স্বরের নির্ণয় করা।

প্রাচীন গ্রন্থকারদের এই দ্বিতীয় পদ্ধতি জানা ছিল না। পণ্ডিত শ্রীনিবাসের রাগতত্ত্ববিবোধ-বর্ণিত নিয়মানুসারে যদি বীণার তারের দৈর্ঘ্য ৩৬" ইঞ্চি মানা হয় তাহা হইলে অতি সহজেই স্বরস্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। স্বর রচনার মূল তত্ত্ব "ষড়জ—পঞ্চম ভাব" ঠিক রাখা।

যথা :— সা — প, রে — ধ, গ — নি, ম — র্সা।

অর্থাৎ বীণাতে উত্তরাঙ্গের স্বর পূর্বাঙ্গস্বরের পঞ্চম হইবে। গ্রীস্‌দেশের লাইকো কোরাস্‌ নামীয় জনৈক দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ "Harmony of the fifth" অর্থাৎ "ষড়জ-পঞ্চম ভাব" বাহির করেন। ইহার অর্থ এই যে, সা হইতে প এর দূরত্বের যেমন সম্বন্ধ তেমনি রে ও ধ, এবং গ ও নি ইত্যাদির সম্বন্ধ একই প্রকারের।

বীণার তারের উপর শ্রীনিবাসের শুদ্ধ স্বর কি করিয়া বাহির করিতে হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

সা — ৩৬" ইঞ্চি। পূর্ব মেরু।——————। উত্তর মেরু (ঘুরচ)

সা—৩৬" ইঞ্চি + ২ = ১৮"।

র্সা

(পূর্ব মেরু) ৩৬" ।————————————। ঘুরচ (উত্তর মেরু)

১৮"

তার র্সা ও উত্তর মেরুর মধ্যস্থানে ১৮" + ২ = ৯" সা̈ (অতি তার)

সা র্সা সা̈

——————————————————————। (ঘুরচ)

৩৬" ১৮" ৯"

মধ্যম—

সা হইতে তার সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ম হইবে।

৩৬″ − ১৮″ = ১৮″

১৮″ ÷ ২″ = ৯″

৩৬″ − ৯″ = ২৭″ = "ম"

৩৬″	২৭″	১৮″	
সা	ম	সাং	সাঃ

ঘুরচ

পঞ্চম

সা ও তার সাং এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ছাড়িয়া উত্তর ভাগে পঞ্চম হইবে।

৩৬″ − ১৮″ = ১৮″ ÷ ৩ = ৬″ × ২ = ১২″

৩৬″ − ১২″ = ২৪″ = "প"

৩৬″	২৪″	১৮″
সা	প	সাং

গান্ধার—গ

সা ও প এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ হইবে।

৩৬″ − ২৪″ = ১২″ ÷ ২ = ৬″ ; ৩৬″ − ৬ = ৩০″ = "গ"

৩৬″	৩০″	২৪″	১৮″
সা	গ	প	সাং

ঋষভ—

সা ও প এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া উত্তর ভাগের দুই ভাগ ছাড়িয়া পূর্ব্ব ভাগে রে হইবে।

৩৬″ − ২৪″ = ১২″ ÷ ৩″ = ৪″ ; ৩৬″ − ৪″ = ৩২″ = "রে"

৩৬″	৩২″	২৪″	১৮″
সা	রে	প	সা̇

ধৈবত—

পঞ্চম ও তার সা̇ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ধ হইবে।

২৪″ − ১৮″ = ৬″ ÷ ২″ = ৩″   ২৪″ − ৩″ = ২১″

উপরোক্ত ধৈবতের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

"পঞ্চমোত্তর ষড়জাখ্য মধ্যে" এই মধ্যে কথাটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ঠিক মধ্যে বা মধ্যের যে কোন স্থানে। অতএব প ও সা̇ এর মধ্যে প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে হইলে "ষড়জ—পঞ্চম—ভাব" দ্বারা প্রকৃত স্থান নির্ণয় করা উচিত।

যথা—সা : প = রে : ধ ;   ৩৬″ : ২৪″ = ৩২″ : ধ

$\therefore$ ধ = $\frac{২৪'' \times ৩২''}{৩৬''} = \frac{৬৪''}{৩} = ২১\frac{১}{৩}''$ তে ধৈবতের প্রকৃত স্থান

৩৬″	৩২″	২৪″	২১⅓″	১৮″
সা	রে	প	ধ	সা̇

পঞ্চম ও তার সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ছাড়িয়া উত্তর ভাগে নি হইবে।

২৪" − ১৮" = ৬" ÷ ৩ = ২" + ২" = ৪"

২৪" − ৪" = ২০" = "নি"

৩৬"	২৪"	২০"	১৮"
সা	প	নি	সা

এখন মনে রাখিতে হইবে যে পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শুদ্ধ ঠাটকে বর্ত্তমানে আমরা কাফি ঠাট মানিয়া থাকি।

———

শ্রীনিবাসের শুদ্ধ স্বর, তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা—

স্বর	স্বরসমূহের নাম	তারের দৈর্ঘ্য	আন্দোলন সংখ্যা
সা	ষড়জ (মধ্যসপ্তক)	৩৬″	২৪০
রে	ঋষভ (মধ্যসপ্তক)	৩২″	২৭০
গ	গান্ধার (মধ্যসপ্তক)	৩০″	২৮৮
ম	মধ্যম (মধ্যসপ্তক)	২৭″	৩২০
প	পঞ্চম (মধ্যসপ্তক)	২৪″	৩৬০
ধ	ধৈবত (মধ্যসপ্তক)	২১$\frac{১}{৩}$″	৪০৫
নি	নিষাদ (মধ্যসপ্তক)	২০″	৪৩২
সা̇	ষড়জ (তারসপ্তক)	১৮″	৪৮০
সা̈	ষড়জ (অতি তারসপ্তক)	৯″	৯৬০

শ্রীনিবাসের বিকৃত স্বর কি করিয়া বাহির করিতে হইবে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

কোমল—রে

মধ্য সা (পূর্ব মেরু) এবং শুদ্ধ রে পর্য্যন্ত তারের দৈর্ঘ্যকে তিন ভাগ করিয়া সা হইতে দ্বিতীয় ভাগে রে হইবে।

৩৬″ – ৩২″ = ৪″ ÷ ৩ = ৩ × $\frac{১}{৩}$ = $\frac{৮}{৩}$; ৩৬″ – $\frac{৮}{৩}$″

$= \frac{১০৮ - ৮}{৩} = \frac{১০০}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩}''$ = "রে̱" হইবে।

(পূর্ব মেরু) ৩৬"	৩৩⅓"	৩২"
সা	রে̱	রে

তীব্র গান্ধার—

পূর্ব মেরু ও ধৈবতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে "গ" হইবে।

$= ৩৬'' - \frac{৬৪}{৩''} = \frac{১০৮ - ৬৪}{৩} = \frac{\cancel{৪৪}^{২২}}{৩} \times \frac{১}{\cancel{২}} = \frac{২২''}{৩};\ ৩৬ - \frac{২২}{৩''}$

$= \frac{১০৮ - ২২}{৩} = \frac{৮৬}{৩} = ২৮\frac{২''}{৩}$ = "গ"

৩৬"	২৮⅔	২১⅓"
সা	গ	ধ

তীব্র মধ্যম—

গ ও সা̇ এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দ্বিতীয় ভাগে তীব্র মধ্যম হইবে।

$\frac{৮৬}{৩''} - ১৮'' = \frac{৮৬ - ৫৪}{৩} = \frac{৩২}{৩};\quad \frac{৩২}{৩} \div ৩ = \frac{৩২}{৩} \times \frac{১}{৩} = \frac{৩২}{৯''};$

$\frac{৮৬}{৩''} - \frac{৩২}{৯''} = \frac{২৫৮ - ৩২}{৯} = \frac{২২৬}{৯} = ২৫\frac{১}{৯}''$ = ম̍

২৮⅔"	২৫ ১/৯"	১৮"
গ	ম̍	সা̇

কোমল ধৈবত

প ও সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ ছাড়িয়া পূর্ব ভাগে কোমল "ধ" হইবে। ঠিক কোন্ স্থানে হইবে তাহা নির্ণয়ের জন্য "ষড়জ-পঞ্চম ভাব" দ্বারা বাহির করিলে উপরোক্ত স্বরটীর নির্দ্দিষ্ট স্থান পাওয়া যাইবে।

$$\text{সা} : \text{প} = \underline{\text{রে}} : \underline{\text{ধ}} \quad \therefore \; ৩৬ : ২৪ = \frac{১০০}{৩} : \underline{\text{ধ}}$$

$$\frac{\not{২৪}^{২} \times ১০০}{\not{৩৬}^{৩} \times ৩} = \frac{১০০}{৯} = ২২\frac{২''}{৯}$$

২৪″	২২ $\frac{২}{৯}$″	১৮″
প	ধ	র্সা

তীব্র নিষাদ—

ধৈবত ও তার সা এর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিন ভাগ করিয়া পূর্ব্বের দুই ভাগের উত্তরে নি হইবে।

$$\frac{৬৪''}{৩} - ১৮'' = \frac{৬৪ - ৫৪}{৩} = \frac{১০''}{৩};$$

$$\frac{১০}{৩} \div ৩ = \frac{১০}{৯} \times ২ = \frac{২০''}{৯};$$

$$\frac{৬৪''}{৩} - \frac{২০''}{৯} = \frac{১৯২ - ২০}{৯} = \frac{১৭২}{৯} = ১৯\frac{১}{৯} = \text{তীব্র নি।}$$

২১ $\frac{১}{৩}$″	১৯ $\frac{১}{৯}$″	৮″
ধ	নি	সা

পণ্ডিত শ্রীনিবাসের পাঁচটি বিকৃতস্বর, তারের দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা

স্বর	স্বরসমূহের নাম	তারের দৈর্ঘ্য	আঃ সংখ্যা
রে̲	কোমল ঋষভ (মধ্যসপ্তক)	৩৩ $\frac{১}{৩}$"	২৫৯ $\frac{১}{৫}$
গ	তীব্র গান্ধার (,,)	২৮ $\frac{২}{৩}$"	৩০১ $\frac{১৭}{৪৩}$
ম'	তীব্র মধ্যম (,,)	২৫ $\frac{১}{৯}$"	৩৪৪ $\frac{৮}{১১৩}$
ধ̲	কোমল ধৈবত (,,)	২২ $\frac{২}{৯}$"	৩৮৮ $\frac{৪}{৫}$
নি	তীব্র নিষাদ (,,)	১৯ $\frac{১}{৯}$"	৪৫২ $\frac{৪}{৪৩}$

মঞ্জরীকার (ভাতখণ্ডে) বর্ণিত ১২টী স্বর

স্বর	শুদ্ধ অথবা বিকৃত	তারের দৈর্ঘ্য	আঃ সংখ্যা
সা	শুদ্ধ	৩৬"	২৪০
রে̲	কোমল (বিকৃত)	৩৪"	২৫৪ $\frac{২}{১৭}$
রে	তীব্র (শুদ্ধ)	৩২"	২৭০
গ̲	কোমল (বিকৃত)	৩০"	২৮৮
গ	তীব্র (শুদ্ধ)	২৮ $\frac{২}{৩}$"	৩০১ $\frac{১৭}{৪৩}$
ম	কোমল (শুদ্ধ)	২৭"	৩২০

স্বর	শুদ্ধ অথবা বিকৃত	তারের দৈর্ঘ্য	আঃ সংখ্যা
ম	তীব্র (বিকৃত)	২৫ ১/২″	৩৩৮ ১৪/১৭
প	(শুদ্ধ)	২৪″	৩৬০
ধ	কোমল (বিকৃত)	২২ ২/৩″	৩৮১ ৩/১৭
ধ	তীব্র (শুদ্ধ)	২১ ১/৩″	৪০৫
নি	কোমল (বিকৃত)	২০″	৪৩২
নি	তীব্র (শুদ্ধ)	১৯ ১/৯″	৪৫২ ৪/৪৩
সা	তার (শুদ্ধ)	১৮′	৪৮০

বিঃ দ্রঃ—প্রাচীন গ্রন্থকারদের সহিত মঞ্জরীকারের কোমল রে, কোমল ধ ও তীব্র ম এর দৈর্ঘ্য ও আন্দোলন সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। এই তিনটি স্বর ব্যতীত অন্যান্য স্বর সম্পর্কে শ্রীনিবাস ও মঞ্জরীকারের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ নাই।

পণ্ডিত শ্রীনিবাস, মঞ্জরীকার (পঃ ভাতখণ্ডে) ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আন্দোলন সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীনিবাস		মঞ্জরীকার		পাশ্চাত্য পণ্ডিত	
স্বরের নাম	আঃ সংখ্যা	স্বরের নাম	আঃ সংখ্যা	স্বঃ নাম	আঃ সংখ্যা
ষড়্জ শুদ্ধ	২৪০	ষড়্জ শুদ্ধ	২৪০	C	২৪০
ঋষভ কোমল	২৫৯ ১/৫	ঋষভ কোমল	২৫৪ ২/১৭	C″	২৫৬
ঋষভ শুদ্ধ	২৭০	ঋষভ শুদ্ধ	২৭০	D	২৭০
গান্ধার শুদ্ধ	২৮৮	গান্ধার কোমল	২৮৮	D″	২৮৮
গান্ধার তীব্র	৩০১ ১৭/৪৩	গান্ধার শুদ্ধ	৩০১ ১৭/৪৩	E	৩০০
মধ্যম শুদ্ধ	৩২০	মধ্যম শুদ্ধ	৩২০	F	৩২০
মধ্যম তীব্র	৩৪৪ ৮/১১৩	মধ্যম তীব্র	৩৩৮ ১৪/১৭	F″	৩৩৭ ১/২
পঞ্চম	৩৬০	পঞ্চম	৩৬০	G	৩৬০
ধৈবত কোমল	৩৮৮ ৪/৫	ধৈবত কোমল	৩৮১ ৩/১৭	G″	৩৮৪
ধৈবত শুদ্ধ	৪০৫	ধৈবত শুদ্ধ	৪০৫	A	৪০০
নিষাদ শুদ্ধ	৪৩২	নিষাদ কোমল	৪৩২	B (flat)	৪৩২
নিষাদ তীব্র	৪৫২ ৪/৪৩	নিষাদ শুদ্ধ	৪৫২ ৪/৪৩	B	৪৫০
তার সাঁ	৪৮০	তার সাঁ	৪৮০	C	৪৮০

———

২২টি শ্রুতির উপর আধুনিক যুগের ১২টি স্বরস্থান

শ্রুতির সংখ্যা	শ্রুতির নাম	স্বর	স্বরের আন্দোলন
১	তীব্রা	সা (অচল)	২৪০
২	কুমুদ্বতী	—	—
৩	মন্দা	রে (কোমল)	২৫৪ ২/১৭
৪	ছন্দাবতী	—	—
৫	দয়াবতী	রে (তীব্র)	২৭০
৬	রঞ্জনী	—	—
৭	রক্তিকা	গ (কোমল)	২৮৮
৮	রৌদ্রী	গ (তীব্র)	৩০১ ১৭/৪৩
৯	ক্রোধী	—	—
১০	বজ্রিকা	ম (কোমল বা শুদ্ধ)	৩২০
১১	প্রসারিণী	—	—
১২	প্রীতি	ম (তীব্র)	৩৩৮ ১৪/১৭
১৩	মার্জনী	—	—
১৪	ক্ষিতি	প (অচল)	৩৬০
১৫	রক্তা	—	—
১৬	সন্দিপিনী	ধ (কোমল)	৩৮১ ৩/১৭

শ্রুতির সংখ্যা	শ্রুতির নাম	স্বর	স্বরের আন্দোলন
১৭	আলাপিনী	—	—
১৮	মদন্তী	ধ (তীব্র)	৪০৫
১৯	রোহিণী	—	—
২০	রম্যা	নি (কোমল)	৪৩২
২১	উগ্রা	নি (তীব্র)	৪৫২·৪/৪৩
২২	ক্ষোভিণী	—	—
১	তীব্রা	র্সা (তার)	৪৮০

———

গীত :— মনোরঞ্জনকারী স্বরসমূহকে গীত বলা হয়। উহার দুইটি ভাগ আছে ; যথা, গান্ধর্ব্ব ও গান।

গান্ধর্ব্ব :—যে গীত অনাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ বেদের সমান অপৌরুষেয় এবং শব্দ প্রধান তাহাকে গান্ধর্ব্ব গীত বলা হইত। স্বর্গ লোকে গন্ধর্ব্বেরা এই সংগীত গাহিতেন এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষপ্রাপ্তি।

গান :—যে সংগীত বাগ্গেয়কার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সৃষ্টি করিয়া লক্ষণবদ্ধ ভাবে দেশী রাগাদিতে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার করিতেন তাহাকে গান বলা হইত এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা।

দেশী সঙ্গীত :—গান্ধর্ব্ব ও গানের অন্য দুইটী নাম ছিল—মার্গ ও দেশী। সারঙ্গদেবের সময় পর্য্যন্ত সর্বত্র দেশী সংগীত প্রচলিত ছিল। তৎকালীন দেশী সংগীত বর্ত্তমান কালের হিন্দুস্থানী সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। দেশী সংগীত বিভিন্ন দেশের লোক-রুচির উপর নির্ভর করে। ইহা নিয়মবদ্ধ নহে। সমাজ ও লোক-রুচির পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে ইহারও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই সংগীত মানব হৃদয়ে সহজেই প্রভাব বিস্তার করে।

নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান :—সারঙ্গদেবের সময়ে আধুনিক কালের খেয়াল ও ধ্রুপদের প্রচার ছিল না। সেই সময়ে প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক ইত্যাদি গাওয়া হইত। প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন অবয়বকে ধাতু বলা হইত। সঙ্গীত রত্নাকরে উক্ত ধাতু সমূহের নিম্নোক্ত পাঁচটী নাম উল্লিখিত আছে যথা:— (১) উদ্‌গ্রাহ, (২) ধ্রুব, (৩) মেলাপক, (৪) অন্তরা, (৫) আভোগ। বর্ত্তমানকালের সঙ্গীতে যেমন স্থায়ী,

২

অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ আছে, প্রবন্ধ গানেও উল্লিখিত ধাতু সমূহের ব্যবহার ছিল। বর্ত্তমানে প্রবন্ধ গানের প্রচলন না থাকায় ধাতু সম্পর্কে আলোচনা অনাবশ্যক। রত্নাকরে বহু প্রকার প্রবন্ধের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ গানের গীতরীতি নিবদ্ধ গানের গায়ন পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীনকালে শাস্ত্রোক্ত, সুনির্দিষ্ট নিয়মে যে গান গাওয়া হইত তাহাকে নিবদ্ধ গান বলা হইত। বিভিন্ন প্রকার তাল এবং বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ গীতাবয়বের সীমারেখা দ্বারা ঐ প্রকার গানকে আবদ্ধ করা হইত।

অনিবদ্ধ গান নিবদ্ধ গানের বিপরীত। ইহা তালবদ্ধ নহে এবং গীতাবয়বের নিয়ম সমুহ নিবদ্ধ গানের ন্যায় কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইত না। সারঙ্গদেব 'আলপ্তিগান' (বর্ত্তমানে আলাপ) কে অনিবদ্ধ গানের পর্য্যায়ভুক্ত রাখিয়া ছিলেন। আলাপ ও আলপ্তি গানের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও ইহারা অনিবদ্ধ গানেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

স্বস্থান :—প্রাচীনকালে রাগ বিশেষে বিভিন্ন স্বরের সুনির্দিষ্ট স্থান। প্রাচীনকালে আলাপের আর একটি সুন্দর নিয়ম ছিল। ইহাকে স্বস্থান নিয়ম বলা হইত। গায়ককে প্রত্যেক আলাপ স্বস্থানের ক্রমানুযায়ী গাহিতে হইত। উহা এইরূপ :—

বাদী স্বরের উপর সমস্ত রাগ নির্ভর করিত। বাদীস্বরকে স্থায়ী স্বর বলা হইত। বাদী স্বর হইতে চতুর্থ স্বরকে "দ্বয়ার্দ্ধ" স্বর বলা হইত। স্থায়ী স্বর হইতে অষ্টম স্বরকে "দ্বিগুণ" স্বর বলা হইত। দ্বয়ার্দ্ধ ও দ্বিগুণ স্বরের মধ্যবর্তী স্বর সমূহকে "অর্দ্ধস্থিত" স্বর বলা হইত। প্রথম স্বস্থানে গায়ককে সর্বদা নিজের আলাপ দ্বয়ার্দ্ধ স্বরের নীচে

রাখিতে হইত। মন্দ্র-সপ্তকে গায়ক ইচ্ছামত আলাপ করিতে পারিত।

রাগালাপ :—প্রাচীনকালে যে গান রাগের গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব ও ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্ব এই দশটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হইত তাহাকে রাগালাপ বলা হইত।

রূপকালাপ :—প্রাচীন আলাপেরই প্রকার ভেদ মাত্র। অতএব রাগালাপের ব্যাখ্যায় যে বিষয় কথা বলা হইয়াছে রূপকালাপেও তাহা অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু ইহাতে একটি মুখ্য বিষয় এই ছিল; রূপকালাপে গায়ককে প্রবন্ধের ধাতুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে আলাপ করিতে হইত। এই সকল বিভিন্ন ভাগের সর্বশেষ স্বরটিকে অপন্যাস স্বর বলা হইত। ইহাতে ভাষা এবং তালের অভাব থাকিত। রূপকালাপ রাগালাপ হইতে অধিক বিস্তৃত হইত। রূপকালাপকে রাগালাপের পুর্ববর্ত্তী ধাপ বলা যাইতে পারে।

রাগ লক্ষণ :—অর্থাৎ রাগ বিশেষের বৈশিষ্ট্য। ঐগুলি রাগালাপের সাহায্যেই প্রকাশ করা হইত। অতএব "রাগালাপ" ও "রাগ লক্ষণ" এই শব্দ দুইটির মুলগত উদ্দেশ্য একই।

(১) গ্রহস্বর—যে স্বর হইতে রাগ আরম্ভ করা হইত।

(২) অংশস্বর—যে স্বর রাগে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইত তাহাকে অংশস্বর, জীবস্বর অথবা বাদীস্বর বলা হইত।

(৩) মন্দ্রস্বর—যে স্বর মন্দ্র সপ্তকে গাওয়া হইত।

(৪) তারস্বর—যে স্বর তারসপ্তকে গাওয়া হইত।

(৫) ন্যাসস্বর—রাগ গাহিবার সময় যে স্বরে বিশ্রাম করা হইত।

(৬) অপন্যাস—রাগ যে স্বরের উপর শেষ করা হইত।

(৭) সন্যাস—যে স্বরের উপর গীতের আদিভাগ শেষ করা হইত।

(৮) বিন্যাস—গীতের প্রথমভাগের প্রথম পংক্তির শেষে যে স্বরটি থাকিত।

(৯) ষাড়বত্ব—যে রাগে ছয়টি স্বরের নিয়ম রক্ষা করা হইত।

(১০) ঔড়বত্ব—যে রাগে পাঁচটি স্বরের নিয়ম রক্ষা করা হইত।

অপন্যাস, সন্যাস ও বিন্যাস এইগুলি গীতের বিভিন্ন রাগের অন্তিম স্বর ছিল। এই ভাগগুলিকে "বিদারী" বলা হইত।

বহুত্ব :—রাগালাপে স্বরের বহুল প্রয়োগ বিধিকে বহুত্ব বলা হইত। স্বরকে দুই প্রকারে বহুত্ব দেওয়া হইত—অলঙ্ঘন ও অভ্যাস দ্বারা। রাগের বাদী ও সম্বাদী স্বর ব্যতীত অন্য অনুবাদী স্বরের বহুল প্রয়োগ করিয়া অলঙ্ঘন দ্বারা উক্ত স্বরটিকে বহুত্ব দেওয়া হইত। যথা—জৌনপুরী রাগে পঞ্চম অথবা মধ্যম। রাগালাপে একই স্বরকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাকে অভ্যাস বলিত। অভ্যাস দুই প্রকারে করা হইত। যথা—

(১) একই স্বর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া, অথবা

(২) অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্বর সহযোগে উক্ত স্বরটিকে প্রাধান্য দিয়া রাগের বাদী ও সম্বাদী স্বরকে সাধারণতঃ বহুত্ব দেওয়া হইত।

অল্পত্ব :—রাগালাপে স্বরের অল্প প্রয়োগ বিধিকে অল্পত্ব বলা হইত। স্বরকে দুই প্রকারে অল্পত্ব দেওয়া হইত—লঙ্ঘন ও অনভ্যাস দ্বারা।

লঙ্ঘন অর্থাৎ বর্জ্জন। কোনও রাগে বর্জিত স্বর-সমূহ হইতে কোনও একটি স্বরের অল্প প্রয়োগ হইলে উক্ত বিবাদী স্বরটিকে লঙ্ঘন দ্বারা অল্পত্ব দেওয়া হইত। যথা—ভৈরব রাগে কোমল নিষাদ।

রাগের নিয়মিত স্বর সমূহের মধ্যে যে স্বরগুলি অধিক প্রয়োগ করা যাইত না তাহাকে অনভ্যাস দ্বারা অল্পত্ব দেওয়া হইত। যথা—বেহাগ রাগে ঋষভ ও ধৈবত।

আবির্ভাব-তিরোভাব :—এক মেল হইতে অনেক রাগ উৎপন্ন হইতে পারে। যখন কোন গায়ক গাহিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন স্বর সমুদয়ের সাহায্যে কোন রাগের বিস্তার করিতে থাকেন তখন শ্রোতাগণের উপরোক্ত রাগে সমপ্রকৃতি অন্য রাগের অংশ শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা থাকে; কেন না সমপ্রকৃতি রাগের কতকগুলি স্বর একই প্রকার হইয়া থাকে। উহা শ্রবণে শ্রোতাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন রাগের ছায়া প্রতিফলিত হয়; কিন্তু কুশলী গায়ক ঐ সময় উক্ত রাগের বিশেষ অথবা স্বতন্ত্র অঙ্গ যোগ্যস্থানে রাখিয়া শ্রোতাদের মনের সন্দেহ খুব কুশলতার সহিত দূর করিয়া থাকেন। এইরূপ করিবার সময় রাগের কোন প্রকার হানি হইতে দেন না।

এইরূপ গাহিবার সময় যখন মূল রাগ ক্ষণিকের জন্য অপসারিত অথবা অদৃশ্য হয় তখন উহাকে রাগের তিরোভাব বলা হয় এবং যখন রাগ পুনরায় স্পষ্টভাবে দেখা দেয় তখন তাহাকে রাগের আবির্ভাব বলা হয়।

স্থায় :—ছোট ছোট স্বরবিন্যাস সমুদয়কে "স্থায়" বলা হয়।

যথা—নিসা, রেসা, নিসা ইত্যাদি।

মুখচালন :—রাগোপযোগী নানাবিধ গমক, মীড়, অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া গাহিলে অথবা বাজাইলে তাহাকে মুখচালন বলা হইত।

আলপ্তি :—আলপ্তি এক প্রকার প্রাচীন আলাপ পদ্ধতি। আলপ্তিতে রাগকে পরিপূর্ণ রীতি অনুসারে করা হইত। ইহাতে রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রদর্শন করা হইত।

আক্ষিপ্তিকা :—তাল, স্বর এবং শব্দ এই তিনটির সহায়তায় যে গীত রচিত হইত তাহাকে "আক্ষিপ্তিকা" বলা হইত। আক্ষিপ্তিকা (নিবদ্ধগান) যথা—খেয়াল, ধ্রুপদ এবং ধামার ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আক্ষিপ্তিকা নিবদ্ধ গানের শ্রেণীতে পড়ে।

বাগ্গেয়কার :—প্রাচীনকালে যে সব সংগীতবিদ্‌গণ পদ্য রচনা এবং স্বর রচনা করিতে পারিতেন তাহাদিগকে বাগ্গেয়কার বলা হইত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ বিদ্বানকে Composer বলেন। বাগ্গেয়কারের সাহিত্য এবং সংগীত এই দুইটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাগ্গেয়কার শব্দটির ব্যুৎপত্তি এইরূপ—বাক্+গেয় অর্থাৎ যাঁহার পদ্য রচনায় ও স্বর রচনায় কুশলতা আছে। বাক্ অর্থাৎ পদ্য রচনা এবং গেয় অর্থাৎ স্বর রচনা। ইহাদের অনেকে মাতু এবং ধাতু বলিয়া থাকেন। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে বাগ্গেয়কারের নিম্নলিখিত গুণ থাকা প্রয়োজন।

১। শব্দানুশাসন জ্ঞান—ব্যাকরণ শাস্ত্র জ্ঞান।

২। অভিধান প্রবীণতা—অমর কোষাদি গ্রন্থের জ্ঞান।

৩। ছন্দ প্রভেদ বেদিত্ব—সকল প্রকার ছন্দের জ্ঞান।

৪। অলঙ্কার কৌশল—সংগীত শাস্ত্রে উল্লিখিত অলঙ্কারের জ্ঞান।

৫। রসভাব পরিজ্ঞান—সাহিত্য বর্ণিত শৃঙ্গার রস তথা বিভাবাদি ভাবের উত্তম জ্ঞান।

৬। দেশস্থিত জ্ঞান—বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রীতি ও নীতির জ্ঞান।

৭। অশেষ ভাষা জ্ঞান—বহু প্রকার ভাষার জ্ঞান।

৮। কলাশাস্ত্র কৌশল—সংগীতাদি শাস্ত্রে প্রবীণতা।

৯। তুর্য্য ত্রিতয় চাতুর্য্য—গীত, বাদ্য ও নৃত্য পারদর্শিতা।

১০। হৃদ্য শারীর শালিতা - যিনি হৃদ্য অর্থাৎ মনোহর শারীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধিক পরিশ্রম না করিয়া সহজেই যিনি রাগরূপ প্রকাশ করিতে পারেন তাহাকে উত্তম শারীর প্রাপ্ত বলা হইত। "শারীর" একটি পারিভাষিক শব্দ।

১১। লয় তাল কলা জ্ঞান—তাল, লয় ও কলার জ্ঞান।

১২। অনেক কাকু জ্ঞান—ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভেদের জ্ঞান। কাকু একটি পারিভাষিক শব্দ। প্রাচীন সংগীতে—

(i) স্বরকাকু, (ii) রাগকাকু, (iii) দেশ-কাকু, (iv) যন্ত্রকাকু, (v) ক্ষেত্রকাকু, (vi) অন্যরাগকাকু। এই প্রকার ছয়টী কাকুভেদের উল্লেখ আছে। পণ্ডিত কল্লিনাথ "কাকুর্ধ্বনের্বিকারঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৩। প্রভূত প্রতিভোদ্ভেদভাক্ত্ব—অপূর্ব্ব প্রতিভাবান ব্যক্তি।

১৪। সুভগগেয়তা—সুখদায়ক গান করিবার শক্তি।

১৫। দেশীরাগ জ্ঞান—দেশী রাগের জ্ঞান।

১৬। বাক্‌পটুত্ব—সভাতে বিজয়ী হইবার মত বাক্‌পটুতা।

১৭। রাগদ্বেষ পরিত্যাগ—রাগ ও দ্বেষের অভাব।

১৮। সার্দ্রত্ব—সরসতা।

১৯। উচিতজ্ঞতা—কোন্ স্থানে কোন্ জিনিষ যোগ্য হইবে তাহার জ্ঞান।

২০। অনুচ্ছিষ্টোক্তিনির্বন্ধ—স্বতন্ত্র রচনা করিবার ক্ষমতা।

২১। নূত্ন ধাতুবিনির্ম্মিতি জ্ঞান—নূতন নূতন স্বর রচনা করিবার জ্ঞান।

২২। পরচিত্ত পরিজ্ঞান—অন্য লোকের মনের ভাব জানিবার ক্ষমতা।

২৩। প্রবন্ধ প্রগল্‌ভতা—প্রবন্ধের উত্তম জ্ঞান।

২৪। দ্রুত গীতবিনির্মাণ—দ্রুত কবিতা রচনা করিবার ক্ষমতা।

২৫। পদান্তরবিদগ্ধতা—ভিন্ন ভিন্ন গীতের ছায়া অনুকরণ করিবার ক্ষমতা।

২৬। ত্রিস্থানগমক প্রৌঢ়ী—তিন সপ্তকে গমক করিবার ক্ষমতা।

২৭। আলপ্তিনৈপুণ্য—রাগালাপ এবং রূপকালাপের দক্ষতা।

২৮। অবধান—চিত্তের একাগ্রতা।

পণ্ডিত—যিনি সংগীত শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়া কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে গাহিতে বা বাজাইতে পারেন তাহাকে পণ্ডিত বলা হয়।

নায়ক—যিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমান এই উভয় যুগের সংগীত-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং গুরুপরম্পরায় শিক্ষালাভ করিয়া সুর ও তালের বাঁধুনিবদ্ধ সংগীত গাহিতে ও বাজাইতে পারেন তাহাকে নায়ক বলা হয়।

গায়ক—যিনি গুরুপরম্পরায় নায়কী শিক্ষালাভ পূর্বক সংগীতের অন্তর্নিহিত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গীতকে সুললিত ছন্দ, তান, আলাপ প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কারে সুশোভিত করিয়া রসসৃষ্টি দ্বারা লোকচিত্ত বিনোদন করিতে পারেন তাহাকে গায়ক—এবং সেই গাহিবার ভঙ্গিকে গায়কী বলা হয়।

প্রচলিত আলাপ গান - হিন্দুস্থানী সংগীতে গায়ক আলাপে ত, না, ন, রী, রেণ্‌ভো, নোঁ, নারে, নেনোরি, তনন, নেতোঁ, নানা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র আকারের সাহায্যে না করিয়া উপরোক্ত শব্দ সমূহের প্রয়োগে গান করিলে উহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। সাধারণতঃ গায়কদের রূপকালাপ, আলপ্তি, আক্ষিপ্তিকা প্রভৃতির পার্থক্য অজ্ঞাত থাকে। গুণী গায়কগণ রাগের আবির্ভাব—তিরোভাব দেখাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এইরূপ চেষ্টায় নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখা যায় না। আলাপকালে তাহারা সাধারণতঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, এই চারি বিভাগ দেখাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে তাহারা পরম্পরাগত সংস্কার মানিয়া চলেন (স্থায় অংশ গাহিবার সময় তাহারা এক একটি নূতন স্বর সংযোগে মধ্যসপ্তকে ধৈবত, পঞ্চম,

নিষাদ পর্য্যন্ত গাহিয়া থাকেন। তাহার পর তার-ষড়জ ঈষৎ স্পর্শ করিয়া নিম্নস্বরে ফিরিয়া আসিয়া স্থায়ী অংশ সমাপ্ত করেন।)

অন্তরা—মধ্যসপ্তকের গান্ধার, মধ্যম অথবা পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরার অংশ আরম্ভ হয়। অন্তরা গাহিবার সময় বিবিধ রীতির তান করিয়া তার-ষড়জের উপর উহাদের বিরামের পর ধীরে ধীরে মধ্য সপ্তকের ষড়জে আসিয়া অন্তরার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সঞ্চারী—অন্তরা গাহিবার পর সঞ্চারী অংশ গাওয়া হয়। সঞ্চারী সাধারণতঃ সা মা পা ইহার কোন একটি স্বর হইতে আরম্ভ করা হয়। ইহাতে মীড়, কম্পন ও গমকের প্রয়োগ অধিক দেখা যায়। সঞ্চারী প্রধানতঃ তার স্থান পর্য্যন্ত যায় না। উহা মধ্যসপ্তকের পঞ্চম অথবা মধ্যষড়জে সমাপ্ত করা হয়।

আভোগ—সঞ্চারীর পর স্থায়ী না গাহিয়া একেবারে আভোগ গাওয়া হইয়া থাকে। আভোগে গায়ক তারস্থানের যে কোন স্বরে ইচ্ছা মত যাইতে পারেন। আভোগের বিস্তার অনেকটা অন্তরার বিস্তারের মত হইয়া থাকে। উক্তরূপে রাগের বিস্তার সাধারণতঃ মন্দ্র এবং মধ্য-স্থানে হইয়া থাকে। অন্তরার বিস্তার তারস্থানেই অধিক হয় এবং উহার স্বর উচ্চস্থানে অবস্থিত বলিয়া শ্রমসাধ্য। এইজন্য অন্তরার আলাপ স্থায়ীর আলাপের তুলনায় অনেক কম হইয়া থাকে। তারস্থানের আলাপ মন্দ্র এবং মধ্যসপ্তকের আলাপেরই পুনরুক্তি। অতএব উচ্চস্থানে অধিক বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। পূর্বাঙ্গবাদী রাগের আলাপ গায়ক সাধারণতঃ বাদীস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা আরম্ভ করিবার পূর্বে গায়ক

সা অথবা নিসা স্বরের উপরে উত্তমরূপে আলাপ করিয়া শ্রোতার মন আকর্ষণ করেন। আলাপের প্রথম অংশে ছোট ছোট স্বরসমষ্টি প্রয়োগের পর ষড়জে ফিরিয়া আসেন। ষড়জে ফিরিয়া আসার বিশেষ ধরনের ছোট ছোট তান আছে। এই সব তানে বেশীর ভাগ "তোম্" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এই প্রকার তানকে "আলাপের সম" বলা হয়।

সুগায়ক প্রথমেই রাগ বিশেষের বিশিষ্ট স্থান নির্ণয় করিয়া তদ্ অনুযায়ী আলাপ করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ ইমন রাগ গাহিবার সময় গা, পা, নি এবং সা এই স্বরসমূহের উপর অনেক প্রকারের আলাপ করিয়া থাকেন।

উত্তমরূপে আলাপ গাহিতে হইলে গায়কের মধুর কণ্ঠ, রাগজ্ঞান, স্বরজ্ঞান এবং আলাপ গাহিবার বিশিষ্ট রীতির সহিত সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। প্রধানতঃ ধ্রুপদ-গায়কগণ এই প্রকার গান করিয়া থাকেন।

হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী—

সারা ভারতে দুই প্রকার সংগীতের প্রচলন আছে। কর্ণাটকী পদ্ধতি (দক্ষিণ-ভারতীয়—মাদ্রাজ ও মহীশূর অঞ্চল) ও হিন্দুস্থানী পদ্ধতি (দক্ষিণ ভারত ব্যতীত - সারা ভারতে যে সংগীত প্রচলিত)। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংগীত আয়ত্ত করিতে হইলে শিক্ষার্থিগণের নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যথা—

১। হিন্দুস্থানী সংগীতে বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মানা হয়।

২। সমস্ত রাগগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব জাতি।

৩। কোমল ও শুদ্ধস্বর মিলাইয়া ১২ স্বর হইতে সাধারণতঃ ন্যূনতম ৫ স্বর অথবা ৭ স্বরের অধিক রাগে ব্যবহৃত হয় না।

৪। সম্পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব এই তিন প্রকার জাতির আরোহন ও অবরোহন পরিবর্ত্তন করিলে নয় প্রকার জাতির উৎপন্ন হয়।

৫। প্রত্যেক রাগে ঠাট, আরোহ—অবরোহ, বাদী—সম্বাদী সময় ও রঞ্জকতার অবশ্য প্রয়োজন।

৬। বাদী স্বর হইতে সম্বাদীস্বর সাধারণতঃ চতুর্থ বা পঞ্চম স্বরের ব্যবধানে থাকিবে। বাদী পূর্বাঙ্গে থাকিলে সম্বাদী উত্তরাঙ্গে হইবে এবং বাদী উত্তরাঙ্গে থাকিলে সম্বাদী পূর্বাঙ্গে হইবেই।

৭। বাদী স্বর পরিবর্ত্তন করিলে পূর্বাঙ্গের রাগ উত্তরাঙ্গে এবং সেই ভাবেই উত্তরাঙ্গের রাগ পূর্বাঙ্গে গাওয়া যাইতে পারে। যেমন প্রাতঃকালের রাগ দেশকারে ধৈবত বাদী ও গান্ধার সম্বাদী রহিয়াছে এবং ইহার বাদী স্বর পরিবর্ত্তন করিলে সায়ংকালীন ভূপালী রাগে পরিণত হয় যাহার বাদী গান্ধার ও সম্বাদী ধৈবত।

৮। রাগের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে বিবাদী স্বর বা বর্জিত স্বর অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৯। প্রত্যেক রাগের বাদী স্বরটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহাতে সেই রাগটী পূর্বাঙ্গ কি উত্তরাঙ্গের এবং উহার গাহিবার সময় বুঝিতে পারা যায়।

১০। এই পদ্ধতির রাগসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—(১) কোমল রে ধ যুক্ত রাগ (২) শুদ্ধ রে, ধ যুক্ত রাগ, (৩) কোমল গ নি যুক্ত রাগ। প্রথম বর্গের (সন্ধি প্রকাশ) রাগ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় গাওয়া হয়; তাহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গের রাগ গাওয়া হয়।

১১। যে রাগগুলিতে কোমল গ ও নি ব্যবহৃত হয় সেই রাগসমূহ দ্বিপ্রহরে ও মধ্যরাত্রিতে অধিকতর গাওয়া হইয়া থাকে।

১২। সন্ধি প্রকাশ রাগ গাহিবার পর সাধারণতঃ শুদ্ধ রে গ ধ নি —যুক্ত রাগ গাওয়া হইয়া থাকে।

১৩। দিবা এবং রাত্রির তৃতীয় প্রহরে গেয় রাগসমূহে সা ম প স্বর সমুদয়ের ব্যবহারের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়।

১৪। তীব্র মধ্যমের ব্যবহার রাত্রিতে গেয় রাগে অধিক ও দিবা ভাগের রাগে কম দেখা যায়।

১৫। সা, ম, প এই তিনটি স্বর উভয় অঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সব রাগ দিন বা রাত্রির যে কোন সময় গাওয়া হয়, উপরোক্ত তিনটি স্বরের যে কোন একটি স্বর তাহার বাদীস্বর হইবে।

১৬। কোন রাগেই ম, প একই সংগে বর্জিত হয় না।

১৭। সা স্বরটি কোন রাগেই বর্জিত হয় না।

১৮। কোন রাগে সাধারণতঃ একই স্বরের কোমল বা তীব্র এই দুই রূপ পর পর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু কতিপয় রাগে ইহার ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়—যথা ললিত, বসন্ত ইত্যাদি।

১৯। রাগের নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাগ গাহিলে রাগটি অতীব মনোরঞ্জক হয়; কিন্তু রাজ-দরবারে, সংগীত-সম্মিলনীতে বা রঙ্গ-মঞ্চে অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটে।

২০। তীব্র মধ্যম ও কোমল নিষাদের ব্যবহার কোন রাগে একই সংগে খুব কম দেখা যায়।

২১। দুই মধ্যম যুক্ত রাগের স্বর-বিন্যাস সাধারণতঃ একই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। আরোহনে পার্থক্য

থাকিলেও উক্ত রাগ-সমূহের অন্তরার স্বরবিন্যাস প্রায় একই প্রকারের থাকে।

২২। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় দুই মধ্যমযুক্ত রাগে শুদ্ধ মধ্যম আরোহণ এবং অবরোহণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তীব্র মধ্যম কেবলমাত্র আরোহণেই ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ব্যবহার শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা কম।

২৩। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় দুই মধ্যমযুক্ত রাগের আরোহে নিষাদ ও অবরোহে গান্ধার বক্রতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় এবং অবরোহে নিষাদ দুর্বল থাকে।

২৪। হিন্দুস্থানী সংগীতে তাল অপেক্ষা রাগকে এবং কর্ণাটকী সংগীতে রাগ অপেক্ষা তালকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

২৫। পূর্বাঙ্গ রাগ ও উত্তরাঙ্গ রাগের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য যথাক্রমে আরোহে এবং অবরোহে দৃষ্টিগোচর হয়।

২৬। প্রায় প্রত্যেক ঠাট হইতেই পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ রাগ উৎপন্ন হইতে পারে।

২৭। গম্ভীর প্রকৃতির রাগে সাধারণতঃ সা, ম অথবা প হইতে যে কোন একটী স্বর 'বাদী' হয়। ইহার চলন সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে হইয়া থাকে।

২৮। সন্ধি প্রকাশ রাগে করুণ ও শান্ত রস, শুদ্ধ রে গ ধ যুক্ত রাগে শৃঙ্গার ও হাস্যরস এবং কোমল গ নি যুক্ত রাগে বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রসের আভাষ পাওয়া যায়।

২৯। এক ঠাট হইতে অন্য ঠাটে প্রবেশ করার পুর্ব মুহূর্ত্তে যে রাগটী গাওয়া হয় তাহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়।

৩০। যে সব রাগেতে কোমল নিষাদের ব্যবহার আছে সেই সব রাগের আরোহেতে প্রায়ই শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন কাফি ও খাম্বাজ ঠাটের রাগ।

৩১। দুই তিন বা চার স্বরের দ্বারা তান হইতে পারে কিন্তু রাগ হইতে পারে না।

৩২। দিবা ১২টা ও রাত্রি ১২টার পর যে সব রাগ গাওয়া হয় সেই সব রাগে সা ম প স্বর সমূহের সমধিক ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

৩৩। দ্বি প্রহরের রাগ সমূহে ঋষভ ও নিষাদের ব্যবহার অধিক দেখা যায় এবং অপরাহ্নের রাগের আরোহনে রে ধ দুর্বল তথা প্রায়শঃই বর্জ্জিত হইতে দেখা যায়।

৩৪। প্রাতঃকালের রাগে কোমল রে ধ এর ব্যবহার বেশী দেখা যায় এবং সায়ংকালীন রাগে শুদ্ধ গ ও নি এর ব্যবহার অধিক দেখা যায়।

৩৫। নি সা রে গ স্বর বিন্যাস সন্ধি প্রকাশ রাগের নির্দ্দেশক।

পরমেল প্রবেশক রাগ—পরমেল প্রবেশক কথাটির অর্থ এই যে এক ঠাট হইতে অন্য ঠাটে প্রবেশ করিবার পূর্বমুহূর্ত্তে যে রাগটী গাওয়া হয় তাহাকে পরমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়। ইহার একটি বিশেষ নিয়ম হইতেছে যে উক্ত রাগটীর কতিপয় স্বরবিন্যাস পরবর্ত্তী ঠাটের রাগে দেখা যায়; যথা—মারোয়া রাগের স্বরবিন্যাস উহার পরবর্ত্তী কল্যাণ ঠাটের ইমন রাগে ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণতঃ তিনটী পরমেল প্রবেশক রাগ দেখিতে পাই। যেমন সন্ধি প্রকাশ রাগের প্রথম শ্রেণীতে মারোয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীতে জয়জয়ন্তী এবং তৃতীয় শ্রেণীতে মুলতানী।

সমপ্রকৃতি রাগ—সমপ্রকৃতি রাগ সাধারণতঃ একই ঠাট হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহৃত স্বর সমূহ (তীব্র, শুদ্ধ বা কোমল) ও বাদী, সম্বাদী গাহিবার সময় একই প্রকারের হইতে দেখা যায়, যদিও কখন কখন জাতির পার্থক্য দৃষ্ট হয়; যথা—আশাবরী ও জৌনপুরী। দ্বিতীয়তঃ ঠাট স্বর বাদী ও সম্বাদীর ঐক্য থাকিলেও গাহিবার সময় জাতির পার্থক্য দেখা যায়। যথা—ভীমপলশ্রী ও বাগেশ্রী।

দ্বি-মধ্যম রাগ—যে রাগে উভয় মধ্যম (শুদ্ধ ম ও তীব্র ম) ব্যবহৃত হয় তাহাকে দ্বিমধ্যম রাগ বলে। ঐ রাগের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাতে গ ও নি শুদ্ধ হইবে। কল্যাণ ঠাটের দ্বিমধ্যম রাগে তীব্রমধ্যম শুধু আরোহে প্রয়োগ করা হয়। পরন্তু শুদ্ধ মধ্যম আরোহ এবং অবরোহ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হইয়া থাকে। এই প্রয়োগ বিধিরও কদাচিৎ যে ব্যতিক্রম দেখা যায় না তাহা নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, উপরোক্ত ঠাটের কেদার রাগে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কখন কখন অবরোহীতেও তীব্র মধ্যমের ব্যবহার হইয়া থাকে। কল্যাণ ঠাটের রাগে সাধারণতঃ নিষাদ আরোহে এবং গান্ধার অবরোহে বক্রতা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। পূর্বী ঠাটের রাগেও আরোহ এবং অবরোহীতে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হয়।

পূর্বী রাগে শুদ্ধ মধ্যম কেবল মাত্র অবরোহীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরজ ও বসন্ত রাগে আরোহ ও অবরোহীতে উভয় মধ্যমও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মারোয়া ঠাটের রাগে উভয় মধ্যম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

ভৈরব ঠাটের রাগে তীব্র মধ্যম শুধু আরোহনেই ব্যবহার করা হয় এবং শুদ্ধ মধ্যম উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় স্বরের তুলনা

	উত্তর ভারতীয় স্বর	দক্ষিণ ভারতীয় স্বর
১।	সা (শুদ্ধ)	সা (শুদ্ধ)
২।	কোমল রে	শুদ্ধ রে
৩।	তীব্র অথবা শুদ্ধ রে	চতুঃশ্রুতি রে অথবা শুদ্ধ গ
৪।	কোমল গ	ষট্‌শ্রুতি রে অথবা সাধারণ গ
৫।	তীব্র অথবা শুদ্ধ গ	অন্তর গ
৬।	শুদ্ধ ম	শুদ্ধ ম
৭।	তীব্র ম	প্রতি ম
৮।	প (শুদ্ধ)	প (শুদ্ধ)
৯।	কোমল ধ	শুদ্ধ ধ
১০।	তীব্র অথবা শুদ্ধ ধ	চতুঃশ্রুতি ধ অথবা শুদ্ধ নি
১১।	কোমল নি	ষট্‌শ্রুতি ধ অথবা কৈশিক নি
১২।	তীব্র অথবা শুদ্ধ নি	কাকলী নি

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত গ্রন্থ

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
১। রাগ তরঙ্গিণী	লোচন
২। সংগীত পারিজাত	অহোবল
৩। হৃদয় কৌতুকম্	হৃদয়নারায়ণদেব
৪। হৃদয় প্রকাশঃ	”
৫। রাগতত্ব বিবোধঃ	শ্রীনিবাস
৬। সদ্রাগচন্দ্রোদয়	পুণ্ডীক বিট্‌ঠল
৭। রাগ মালা	”
৮। রাগ মঞ্জরী	”
৯। স্বরমেলকলানিধি *	রামামাত্য
১০। চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা *	ব্যঙ্কটমখী
১১। সংগীতসারামৃতম্ *	তুলজেন্দ্র ভোঁসলে
১২। রাগ লক্ষণম *	গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত
১৩। অষ্টোত্তরশততাললক্ষণম্ *	” ” ”
১৪। অনূপবিলাসঃ	ভাবভট্ট
১৫। অনূপাঙ্কুশ	”
১৬। অনূপসংগীত রত্নাকরঃ	”
১৭। রাগবিবোধঃ *	সোমনাথ
১৮। অভিনবরাগমঞ্জুরী, ক্রমিক পুস্তক মালিকা, ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র ইত্যাদি।	পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

বিঃ দ্রঃ তারকাচিহ্নিত গ্রন্থ সমূহ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের (কর্ণাটকী) প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া মানা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাগ—শুদ্ধ কল্যাণ

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে সমস্ত স্বর শুদ্ধ, কেবলমাত্র অবরোহে তীব্র মধ্যম প্রয়োগ করা হয়।

৩। আরোহে মধ্যম ও নিষাদ বর্জ্জিত।

৪। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৫। বাদী—গ
সম্বাদী—ধ } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

৬। আরোহ—সা, রে গ, প ধ সা।

অবরোহ—সা̇ নি ধ প, ম॑ গ, রে, সা।

৭। পকড়—গ, রে সা, নি̣ ধ̣ প̣, সা, গ রে, প রে, সা।

ইহার সাধারণ প্রকৃতি ভূপালী রাগের মত। এই রাগে মন্দ্র-সপ্তকের প্রয়োগ ভূপালী অপেক্ষা অধিক হয়। এই রাগে কখনও কখনও অবরোহণে তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ থাকিলেও সুগায়কগণ এই স্বর বর্জ্জিত করিয়া প গ এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবরোহণে নিষাদ স্বরের ব্যবহার প্রবল হওয়ার দরুণ ভূপালী রাগ হইতে এই রাগের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। এই রাগের প এবং রে এর সংমিশ্রণ অতি মাধুর্য্যপূর্ণ। এই রাগের ধৈবত স্বর ভূপালীতে ব্যবহৃত ধৈবত স্বর অপেক্ষা কম প্রয়োগ হওয়া উচিত।

৮। আলাপ :—

গ, রে সা ; সা, রে সা গ, রে গ রে, সা রে গ রে সা ;

রে, রে সা নি ধ প, প ধ প, সা, সারেগ রেগ, প গ, রেগরেসা

গ রে গ, প ম গ রে গ, ধ প গ রে, গ প গ রে, গ রে সা।

সা ধ প, গ প রে, সা।

প প গ গ, প প ধ প সা সা, গ রে সা, সা রে গ, রে সা,

রে রে সা, নি ধ ধ প প, গ গ, প ধ প রে সা, নি ধ প,
গ প রে, সা।

রাগ—কামোদ

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগের সমস্ত স্বর শুদ্ধ এবং দুই মধ্যম ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধ মধ্যম আরোহে ও অবরোহে এবং তীব্র মধ্যম কেবলমাত্র আরোহে ব্যবহার হইয়া থাকে।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—প
সম্বাদী—রে } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়— রাত্রি প্রথম প্রহর

৫। আরোহ—সা রে, প, মঁ প, ধ প, নি ধ র্সা।

অবরোহ—র্সা নি ধ প, মঁ প ধ প, গ ম প, গ ম রে সা।

৬। পকড়—রে, প, মঁ প, ধ প, গ ম প, গ ম রে সা।

৭। রে (মধ্যমকে স্পর্শ করিয়া) হইতে প স্বরে পৌঁছাইলে এই রাগের রূপ ফুটিয়া উঠে। এই রাগে গ ও নি স্বর হাম্বির, কেদার ও ছায়ানট ইত্যাদি রাগের মত বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুর্বল। অবরোহণে কখনও কখনও কোমল নিষাদ বিবাদী স্বর রূপে ব্যবহৃত হয়।

৮। আলাপ:—

সা, (ম)রে প, প ধ প গ ম প, গ ম, রে সা (ম)রে প;

সা ম রে সা, রে সা, ধ়, প়, সা রে সা, গ ম প গ ম রে সা,

(ম)রে প।

প় সা, রে সা, ম রে সা, প গ ম রে সা, ধ প গ ম প

গ ম রে সা (ম)রে পা।

সা (ম)রে, প, প, মঁ প ধ প, নি ধ প, র্সা নি ধ প, মঁ প ধ মঁ প,

গ ম প, গ ম রে সা (ম)রে পা।

প প, র্সা, র্রে র্সা র্ম র্রে র্সা, র্গ র্ম র্প র্গ র্ম র্রে র্সা র্রে র্রে র্সা,

ধ প, (ম)রে প, ধ প, র্সা ধ প, গ ম প গ ম রে সা।

রাগ-ছায়ানট

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে সব স্বর শুদ্ধ ও দুই মধ্যম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুদ্ধ মধ্যম আরোহে ও অবরোহে এবং তীব্র মধ্যম কেবল মাত্র আরোহে ব্যবহৃত হয়।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—প
সম্বাদী—রে } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর

৫। আরোহে—সা, রে, গমপ, নিধ, সা।

অবরোহে—সা নি ধ প, ম প ধ প, গ ম রে সা।

৬। পকড়—প, রে, গ ম প, ম গ, ম রে সা।

৭। এই রাগে প ও রে এই দুই স্বরের সংগতি মাধুর্যাপূর্ণ। এই রাগে গান্ধার ও নিষাদ স্বরদ্বয় কেদার, কেদার হাম্বীর ও কামোদ ইত্যাদি রাগের ন্যায় বক্রতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অবরোহণে কখনও কখনও কোমল নি এই রাগে বিবাদীস্বর রূপে ব্যবহৃত হয়।

৮। আলাপ :—

ম
সা, রে সা, ধ প্, সা, রে সা, রে, গ, ম, প, ম গ ম রে,
সা রে, সা।

রাগ—দেশকার

১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে ম ও নি বর্জিত। বাকী স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। বাদী—ধ, সম্বাদী—গ } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—দিবা প্রথম প্রহর।

৫। আরোহ—সা রে গ, প, ধ সা।

অবরোহ—সা ধ, প, গ প ধ প, গ রে সা।

৬। পকড়—ধ, প, গ প, গ রে সা।

৭। এই রাগের যোগ্যস্থানে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ধৈবত ব্যবহার করা হয় অন্যথায় ভূপালী রাগের ছায়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে।

৮। আলাপঃ—

সা, রে সা, গ, রে সা, প গ প, ধ, প,

গ প ধ সা, ধ, প, গ প ধ প, গ রে সা,

সা রে ধ সা, প গ প, ধ প সা, ধ সা, গ রে সা,

রে সা, ধ প, গ প ধ সা, প ধ প, গ প, গ ধ,

প, গ প ধ প, গ রে সা।

———

রাগ—জয়জয়ন্তী

১। এই রাগ খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে

২ জাতি—সম্পূর্ণ।

৩। বাদী—রে, সম্বাদী—প } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের অন্তিম ভাগ।

৪। আরোহ—সা, রে রে. রে গ রে সা, নি ধ প, রে, গ ম প, নি সা।

অবরোহ—সা নি ধ প, ধ ম, রে গ, রে সা।

৫। পকড়—রে গ রে সা, নি ধ প, রে।

৬। এই রাগে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ (কোমল ও শুদ্ধ) ব্যবহৃত হয়। কোমল গান্ধার সর্বদা "রে গ রে" এই ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা সুরট অঙ্গের রাগ। গৌড়, বিলাবল ও সুরট এই তিন রাগের সংমিশ্রণে জয়জয়ন্তী রাগের উৎপত্তি। এই রাগে "প রে", এই স্বর সংগতি মাধুর্য্যপূর্ণ। গ সংযোগ থাকায় সংগীত বিদ্বানগণ ইহাকে "পরমেল প্রবেশক রাগ" নামে অভিহিত করেন। সাধারণতঃ এই রাগ গাহিবার পর কাফী ঠাটের রাগ গাওয়া হয়।

৭। আলাপ :—

সা, ধ নি রে, রে গ রে, গ ম, রে গ রে, রে গ ম প, গ ম, রে গ রে, রে গ ম প ধ প, গ ম, রে গ রে রে সা, ধ নি রে।

সা, ধ নি রে, গ রে, নি ধ রে, রে গ ম, রে গ রে সা, ম প নি সা রে, নি রে, রে ম প সা, নি সা রে, রে সা, রে নি ধ প, প রে সা, রে নি ধ প গ ম, রে গ রে, নি সা, রে, রে।

———

রাগ—রামকেলী

১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। জাতি—সম্পূর্ণ।

৩। বাদী—ধ
সম্বাদী—রে } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—প্রাতঃকাল

৪। আরোহ—সা গ ম প, ধ, নি সা।

অবরোহ সা নি ধ, প, ম প ধ নি ধ, প গ, ম রে সা

৫। পকড়—ধ প, ম প, ধ নি ধ প, গ, ম, রে সা।

৬। এই রাগ সম্বন্ধে ২।৩ প্রকারের মত আছে।

প্রথমতঃ আরোহতে ম ও নি বর্জিত ; যদিও ইহার প্রচার নাই। দ্বিতীয় প্রকার জাতি সম্পূর্ণ মানা হয়। ভৈরব ও রামকেলী এই দুইয়ের পার্থক্যের জন্য ভৈরবের বিস্তার বেশীর ভাগ মন্দ্র ও মধ্যস্থানে এবং রামকেলীর বিস্তার মধ্য ও তারস্থানে হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকারে উভয় মধ্যম এবং উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। সুগায়কগণ এই স্বরগুলিকে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা—"ম প ধ নি ধ প, গ, ম গ, রে সা" এই স্বর সমুদয় রাগে প্রায়ই ব্যবহার হইয়া থাকে। এই রাগের বাদী স্বর সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। দুই মধ্যম ও দুই নিষাদ ব্যবহৃত রাগে পঞ্চমকেও বাদী স্বর মানা যায়। ভৈরব ও রামকেলী রাগে ধৈবত ঋষভ আন্দোলিত কিন্তু ভৈরব রাগের ঋষভ অধিকতর আন্দোলিত হয়।

৭। আলাপ:—

সা গ, ম প ধ, প, গ ম রে সা, ধ, প, ম প, গ ম প, গ ম,

রে সা, প ধ প, সা, রে রে সা ; গ ম ধ প, সা, রে সা নি ধ প,

ম প, ধ নি ধ প, গ ম রে সা।

প প ধ ধ সা, নি সা, ধ, ধ সা, নি সা রে সা, নি সা, ধ প, ম,

ম প, প ধ সা, ধ নি ধ প, ম প, গ ম, রে,

গ ম প, ম রে সা।

রাগ—বসন্ত

১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে দুই মধ্যম, কোমল রে, ধ ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।
আরোহে পঞ্চম বর্জিত।

৩। জাতি—ষাড়ব সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—তার সা, সম্বাদী—প } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি অন্তিম প্রহর।

৫। আরোহ— সা গ, ম ধ, রে সা।
অবরোহ—রে নি ধ, প, ম গ, ম গ ম ধ ম গ, রে সা।

৬। পকড়—ম ধ, রে, সা, রে, নি ধ প, ম গ, ম গ।

৭। এই রাগের দুই প্রকার গীতরীতি প্রচলিত আছে। প্রথম প্রকারে রাগটীকে সম্পূর্ণ জাতির বলিয়া মানা হয়। দ্বিতীয় প্রকারে দুই মধ্যম ও তীব্র ধ ব্যবহার করিয়া এবং পঞ্চম স্বর বর্জিত করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে; এইভাবে গাহিবার সময় শুদ্ধ মধ্যমকে সম্বাদী মানা হয়। কিন্তু এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্তমানকালে শুদ্ধ ধৈবতের পরিবর্তে, কোমল ধৈবত ব্যবহারে গাওয়া হইয়া থাকে এবং তার সা কে বাদী ও পঞ্চমকে সম্বাদী স্বর বলিয়া মানা হয়। বসন্ত ঋতুতে এই রাগ গাওয়া হইয়া থাকে। উত্তরাঙ্গের প্রাধান্য

হেতু স্তার ষড়জের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়া থাকে। এই রাগে ললিতের অঙ্গ আনন্দদায়ক ও বৈচিত্রপূর্ণ। আরোহে পঞ্চম বর্জনের কারণ পরজের ছায়া হইতে বাঁচাইয়া রাখা। ইহার গতি পরজ অপেক্ষা গম্ভীর। ম ধ, রে, সা, নি ধ, প এই স্বর সমন্বয়গুলি বসন্ত রাগের রূপকে স্পষ্ট করে।

এই রাগে "ম গ, ম গ" ও "সা, নি ধ, নি ধ" এই স্বর বিন্যাস গুলিও বারংবার গাওয়া হইয়া থাকে।

৮। আলাপ :—

ম ধ সা, নি ধ প, ম গ, ম গ, ম গ রে সা।

নি সা ম, ম ম গ, ম নি ম গ, ম ধ সা, রে সা, ম গ, ম ধ সা

রে সা, গ রে সা, ম গ রে সা, নি ধ, রে নি ধ,

নি ধ প, ম গ, ম ধ সা।

———

রাগ—পরজ

১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে রে ও ধ কোমল, দুই মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—তারষড়জ, সম্বাদী—পা। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময় রাত্রির অন্তিম প্রহর।

৫। আরোহ—নি সা গ, ম ধ নি সা।

অবরোহ—সা, নি ধ প, ম প ধ প, গ ম গ ম গ রে সা।

৬। পকড়—সা, নি ধ প, ম প ধ প, গ ম গ।

৭। এই রাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান। তারষড়জের প্রাধান্য অতি চমকপ্রদ। এই রাগের গতি চঞ্চল বলিয়া বসন্ত রাগ হইতে ইহার রূপ পৃথক। তান গাহিবার সময় নিষাদ স্বরের উপর সমাপ্তিতে এই রাগের রূপ অধিক স্পষ্ট হয়।—সা রে সা রে নি ধ নি ও ম ধ নি সা নি এই স্বর সমন্বয়গুলি বারংবার প্রয়োগ করিলে রাগের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হয়। কাহারো কাহারো মতে আমির খসরু এই রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কলিঙ্গরা ও সুরট রাগের সংমিশ্রণেই রাগটি তৈরী হইয়াছে।

৮। আলাপ :—

নি সা, গ, ম গ, ম ধ নি, সা, রে নি সা, সা নি ধ প,

ম প ধ প, গ ম গ, ম গ রে সা।

নি সা গ, ম গ, ধ প, গ ম গ, ম ধ নি, ধ প, গ ম গ,

ম ধ নি সা রে সা, ধ প, গ ম গ, রে নি সা, ধ প, গ ম গ,

ম গ রে সা।

ম ধ নি সা নি, ধ নি, ম ধ নি, সা নি ধ নি, সা রে নি সা,

নি ধ নি, ধ প, গ ম গ, ম ধ নি সা।

ম ম গ, ম ধ নি সা, রে সা, সা রে, সা রে, নি সা,

গ রে সা, নি নি রে গ রে সা, রে নি সা নি ধ নি, ধ প,

গ ম গ ম ধ নি সা।

———

রাগ—পূরিয়া

১। এই রাগ মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে কোমল রে, তীব্র ম ও অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। এই রাগে পঞ্চম বর্জিত।

৪। জাতি—ষাড়ব।

৫। বাদী—গ
সম্বাদী—নি } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—সায়ংকাল।

৬। আরোহ—নি রে সা, গ, ম ধ, নি রে সা।

অবরোহ—সা নি, ধ, ম গ, রে সা।

৭। পকড় গ, নি রে সা, নি ধ নি, ম ধ, রে, সা।

৮। এই রাগ প্রধানতঃ মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে পাওয়া হইয়া থাকে। ইহা সন্ধিপ্রকাশ রাগ। নিষাদ ও মধ্যম স্বরের সমন্বয় অত্যন্ত মধুর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। সা, নি ধ নি, ম গ এই স্বরবিন্যাস-গুলি রাগের বৈশিষ্ট্য।

৯। আলাপ:—

গ, নি রে সা, নি ধ নি, ম গ, ম ধ, নি রে সা।

নি রে গ, ম গ, ধ নি রে গ, ম, রে গ, গ ম ধ,

গ ম গ, ম গ রে সা, নি রে, সা।

গ, ম গ, ম ধ নি, ম গ, নি ম গ, ম রে গ, ম গ, নি রে সা।

গ গ, ম ধ সা, নি রে সা, নি রে গ, ম গ রে সা, নি নি ধ নি,

ম গ, ম ধ, নি রে সা।

রাগ—ললিত

১। এই রাগ মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে দুই মধ্যম ও কোমল রে ব্যবহৃত হয়।
অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। এই রাগে পঞ্চম বর্জ্জিত।

৩। জাতি—ষাড়ব।

৪। বাদী—ম, সম্বাদী—সা। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রির প্রহর।

৫। আরোহ—নি রে গ ম ম ম গ, ম ধ, সা।
অবরোহ—রে নি ধ, ম ধ ম ম গ, রে, সা।

৬। পকড়—নি রে গ ম, ধ ম ধ ম ম, গ।

৭। এই রাগে "ধ ম ধ ম ম" ও "নি রে গ ম, ম ম গ" এই স্বর সমন্বয়গুলি রাগ নির্দ্দেশক। কেহ কেহ এই রাগে কোমল ধৈবত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৮। আলাপ :—

নি রে গ, ম, ম ম গ, ম গ রে গ, রে সা, নি রে গ ম।
ম ম গ, ম ধ ম ম গ, ম গ, রে সা, নি রে গ ম।

নি রে গ, রে গ ম, গ ম ধ, ম ধ সা, নি রে নি, ধ নি ধ,

ম ধ ম, গ ম গ, ম গ রে, গ রে সা, নি রে গ ম ধ নি রে নি ধ,

ম ধ ম ম গ ম গ রে সা, নি রে গ ম।

গৌড়—মল্লার

১। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতানুসারে এই রাগ খাম্বাজ ও কাফী এই দুই প্রকার ঠাট হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—ম
সম্বাদী—সা } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—দিবা তৃতীয় প্রহর।

৫। (ক) আরোহ—সা রে ম প, ধ সা।
অবরোহ—সা নি প, ম প গ ম, রে সা। } কাফী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) আরোহ—
রে গ রে ম গ রে সা রে প ম প, ধ র্সা
অবরোহ— র্সা ধ নি প, ম গ ম রে সা। } খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত।

৬। পকড়—রে গ রে ম গ রে সা, প ম প ধ সা, ধ প ম।

৭। এই রাগ দুই প্রকারে প্রচলিত আছে। খেয়াল গানে শুদ্ধ গান্ধার ও দুই নিষাদ এবং ধ্রুপদ গানে কোমল গান্ধার ও দুই নিষাদ প্রয়োগ করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন ধ্রুপদে দুই গান্ধার ও দুই নিষাদের ব্যবহার দেখা যায়। এই রাগ সাধারণতঃ বর্ষাঋতুতেই গাওয়া হইয়া থাকে এবং বহু সংখ্যক গানে বর্ষাঋতুর বর্ণনা পাওয়া যায়।

৮। আলাপ:—

সা, রে সা, রে গ ম, প ম, ধ প, ম গ, রে প, ম, ম গ রে গ ম।

প, ম প, ধ নি প, ধ নি র্সা, ধ নি প, ম প ধ, র্সা রেঁ র্সা।

ধ নি প, ম প সা, (প) ম গ, ম রে প, ম গ, রে গ ম।

———

ম প, ধ, নি প, ম ম প, ধ নি প, সা, ধ নি প,

ম ম প, ধ নি প, সা ধ নি প, রে সা, নি রে সা,

সা ধ নি প, প গ ম রে, রে সা, নি রে সা।

রাগ—আড়ানা

১। এই রাগ আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে গ ও ধ কোমল, উভয় নিষাদ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। আরোহে গান্ধার ও অবরোহে ধৈবত বর্জিত।

৩। জাতি—ষাড়ব।

৪। বাদী—সা } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।
সম্বাদী—প } সময়—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

৫। আরোহ—সা রে ম প, ধ, নি সা।
অবরোহ—সা ধ নি প ম প, গ ম রে সা।

৬। পকড়—সা, ধ, নি সা, ধ, নি প ম প, গ ম রে সা।

৭। কতিপয় গ্রন্থকার এই রাগে শুদ্ধ ধৈবত প্রয়োগ করিয়া ইহাকে কাফী ঠাটের রাগ মানিয়া থাকেন। এই রাগের বিস্তার মধ্য ও তার সপ্তককেই অধিক হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে এই রাগ মেঘ ও কানাড়া রাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

৮। আলাপ :—

সা, ধ, নি প, ম প সা. নি প, ম প, গ, গ ম রে সা,

নি সা রে ম প, ধ, নি রে, সা, নি সা,

নি প, ম প, গ, গ ম রে সা।

ম, প, ম ম, প, ম, নি প, সা নি প, রে সা, নি প, ম ম.

নি প, ধা. নি সা, নি·রে সা, সা ধ, নি প, গ ম রে সা।

———

রাগ—ঝিঁঝিট

১। এই রাগ খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগের নি কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ

৪। বাদী—গ
সম্বাদী—নি } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৫। আরোহ—সা রে গ ম প ধ নি রে সা।

অবরোহ—সা নি ধ প ম গ রে সা।

৬। পকড়—ধ সা, রে ম, গ, প ম গ রে সা নি ধ প।

৭। এই রাগের বিস্তার সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে গাওয়া হইয়া থাকে। ইহার আরোহে ঋষভ ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে খাম্বাজ রাগ হইতে পৃথক রাখা যায়। "ধ সা, রে ম গ," এই স্বর সমুদয় বারংবার গাওয়া হইয়া থাকে এবং ইহাতে রাগের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হয়।

৮। আলাপ :—

ধ সা রে ম গ, প ম, ম গ, রে সা, নি ধ প, ধ সা,

রে ম গ, গ ম প ম গ, ধ প ম প, সা রে গ, সা,

নি ধ প, ধ সা, রে ম গ।

———

রাগ—বিভাষ (ভৈরব ঠাট)

১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। ইহাতে রে ও ধ কোমল এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

ম ও নি বর্জিত।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। বাদী—ধ
সম্বাদী—গ
(মতান্তরে রে) } উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। সময়—প্রাতঃকাল।

৫। আরোহ—সা রে গ প, ধ প সা।

অবরোহ—সা ধ প, গ প ধ প, গ রে সা।

৬। পকড়—ধ, প, গ প, গ রে সা।

৭। যে রাগে ম ও নি স্বর বর্জিত থাকে সেই সব রাগের গ ও প স্বর সংগতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়। এই রাগের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর।

৮। আলাপ :—

ধ ধ প, গ প ধ প, গ রে সা, সা রে গ, গ প, প, ধ প,

সা রে গ প, ধ ধ প, গ প ধ প, গ রে সা।

ধ ধ, প গ প, ধ ধ সা, সা।

সা রে সা, সা রে, গ রে সা, সা রে সা, ধ প,

গ প ধ প গ রে সা।

রাগ—সিন্ধুরা

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে গ ও নি কোমল। আরোহে—গ ও নি বর্জিত।

৩। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৪। বাদী—সা
সম্বাদী—প } পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। সময়—সর্বকালীন রাগ।

৫। আরোহ—সা, রে ম প, ধ, সা।

অবরোহ—সা, নি ধ প ম গ, রে ম গ রে, সা।

৬। পকড়—সা, রে ম প, ধ, সা নি ধ প ম গ রে সা।

৭। এই রাগে নিষাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আরোহে কখনও কখনও নিষাদের প্রয়োগ দেখা যায়।

৮। আলাপ:

ম গ রে সা, ম প, ধ সা, রে গ রে সা, রে সা নি ধ, ম প,

সা নি ধ, ম প ধ, গ রে, নি ধ সা, নি ধ ম প, গ রে, প গ রে,

ম গ রে সা। ম প ধ সা, ধ সা রে গ রে সা, রে সা নি ধ,

ম ম প ধ, সা, নি ধ, রে গ রে সা, নি ধ ম প ধ,

গ রে, ম গ রে সা।

রাগ—তিলং

১। এই রাগ খাম্বাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। এই রাগে উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

ইহাতে রে ও ধ বর্জিত।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। বাদী—গ
সম্বাদী—নি

পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।
সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৫। আরোহ—সা গ ম প নি সা।

অবরোহ—সা, নি প, ম গ, সা।

৬। পকড়—নি সা গ ম প, নি সা, সা নি প, গ ম গ সা।

৭। এই রাগে নি ও প এর স্বরসংগতি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ।
এই রাগে ধৈবত বর্জিত থাকায় খাম্বাজ রাগের সহিত ইহার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।
এই রাগে কখনও কখনও রে অল্প ব্যবহার করা যায়।

৮। আলাপ :—

সা গ, গ ম প, নি প, গ ম গ, প গ ম গ, সা।

গ ম প, গ ম গ, নি সা গ, গ ম প, নি নি সা, নি নি প,

গ ম প, নি প, গ ম গ, প গ ম গ, সা।

কতিপয় রাগের তুলনামূলক আলোচনা

কামোদ — ছায়ানট

—সাদৃশ্য—

(১) উভয় রাগই কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেরই জাতি—সম্পূর্ণ।

(৩) উভয় রাগেই শুদ্ধ ম ও তীব্র ম ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

(৪) উভয় রাগেই আরোহে তীব্র ম ব্যবহৃত হয়।

(৫) উভয় রাগেই আরোহে এবং অবরোহে শুদ্ধ ম ব্যবহৃত হয়।

(৬) উভয় রাগেই গ ও নি বক্র।

(৭) উভয় রাগেই কোমল নি বিবাদী স্বর রূপে ব্যবহার করা হয়।

(৮) উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

—বৈসাদৃশ্য—

কামোদ—	ছায়ানট—
(১) সর্ববাদী সম্মতভাবে বাদী প ও সম্বাদী রে।	(১) বাদী প ও সম্বাদী রে—মতান্তরে রে ও প।
(২) এই রাগে প রে সঙ্গতি মীড় সহযোগে গাওয়া হয় না।	(২) এই রাগে প রে সঙ্গতিমীড় যুক্ত হওয়ায় রাগের রূপ অধিকতর স্পষ্ট হয়।
(৩) এই রাগে গ ও নি দুর্বল।	(৩) এই রাগে কেবলমাত্র নি দুর্বল।

শংকরা — বেহাগ

—সাদৃশ্য—

(১) উভয় রাগই বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৩) উভয় রাগেই বাদী গ ও সম্বাদী নি।

(৪) উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

(৫) উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।

(৬) উভয় রাগেই আরোহে রে বর্জিত।

(৭) উভয় রাগেই অবরোহে রে অল্প ব্যবহৃত হয়।

—বৈসাদৃশ্য—

শংকরা—	বেহাগ—
(১) জাতি ষাড়ব—মতান্তরে ঔড়ব।	(১) জাতি ঔড়ব—সম্পূর্ণ
(২) বাদী গ ও সম্বাদী নি—মতান্তরে সা ও প।	(২) সর্ববাদীসম্মত ভাবে বাদী গ ও সম্বাদী নি।
(৩) গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর—মতান্তরে মধ্যরাত্রি।	(৩) গাহিবার সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
(৪) এই রাগে ম বর্জিত।	(৪) এই রাগে শুদ্ধ ম ব্যবহৃত হয়।
(৫) আরোহে ধ ব্যবহৃত হয়।	(৫) আরোহে ধ বর্জিত।

দেশকার — ভূপালী

—সাদৃশ্য—

(১) উভয় রাগেই শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়

(২) উভয় রাগেই ম ও নি বর্জিত।

(৩) উভয় রাগেরই জাতি ঔড়ব—ঔড়ব

—বৈসাদৃশ্য—

দেশকার—	ভূপালী—
(১) বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন।	(১) কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন।
(২) বাদী ধ ও সম্বাদী গ।	(২) বাদী গ ও সম্বাদী ধ।
(৩) উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।	(৩) পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।
(৪) গাহিবার সময়—দিবা প্রথম প্রহর।	(৪) গাহিবার সময়—দিবা প্রথম প্রহর।

মুলতানী — তোড়ী

—সাদৃশ্য—

(১) উভয় রাগই তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই কোমল রে, কোমল গ, তীব্র ম কোমল ধ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

—বৈসাদৃশ্য—

মূলতানী—	তোড়ী—
(১) জাতি ঔড়ব—সম্পূর্ণ।	(১) জাতি—সম্পূর্ণ।
(২) বাদী প ও সম্বাদী সা।	(২) বাদী ধ ও সম্বাদী গ।
(৩) পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।	(৩) উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।
(৪) গাহিবার সময়—দিবা চতুর্থ প্রহর।	(৪) গাহিবার সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।
(৫) এই রাগে আরোহে তীব্র ম স্পর্শ করিয়া কোমল গ গাওয়া হয়।	(৫) এই রাগে আরোহে কোমল রে স্পর্শ করিয়া কোমল গ গাওয়া হয়।

পূরিয়া — মারোয়া

—সাদৃশ্য—

(১) উভয় রাগই মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেরই জাতি—ষাড়ব।

(৩) উভয় রাগেই কোমল রে, তীব্র ম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

(৪) উভয় রাগই সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

(৫) উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।

—বৈসাদৃশ্য—

পূরিয়া—	মারোয়া—
(১) বাদী ও সম্বাদী নি।	(১) বাদী রে ও সম্বাদী ধ।
(২) এই রাগে মীড় অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রাগের সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।	(২) এই রাগে মীড়ের ব্যবহার অত্যান্ত অল্প ; অধিক ব্যবহারে রাগের রূপ ক্ষুন্ন হয়।
(৩) এই রাগের বিস্তার মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে অধিক হইয়া থাকে।	(৩) এই রাগের বিস্তার মধ্য-সপ্তকে অধিক হইয়া থাকে।
(৪) এই রাগে নি ম সঙ্গতি খুবই সৌন্দর্য্যপূর্ণ—ইহাতে রাগের বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।	(৪) এই রাগে ধ ম গ রে এই স্বর-সঙ্গতি রাগের বৈশিষ্ট্য উত্তমরূপে প্রকাশ করে।
(৫) এই রাগে কোন স্বরই বক্র নহে।	(৫) এই রাগে আরোহে নি এবং অবরোহে রে বক্র।

বসন্ত — পরজ

সাদৃশ্য—

১। উভয় রাগই পুরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। উভয় রাগেরই জাতি—সম্পূর্ণ।

৩। উভয় রাগেই কোমল রে, কোমল ধ, শুদ্ধ গ ও নি ব্যবহৃত হয়।

৪। উভয় রাগেই শুদ্ধ ম ও তীব্র ম ব্যবহৃত হয়।

৫। উভয় রাগেই বাদী র্সা এবং সম্বাদী প।

৬। উভয় রাগেরই গাহিবার সময়—রাত্রি চতুর্থ প্রহর।

৭। উভয়ই উত্তরাঙ্গবাদী রাগ।

৮। উভয় রাগেতেই তার র্সা এর উপর ন্যাস করিয়া রাগের বৈচিত্র বৃদ্ধি করা হয়।

৯। উভয় রাগই প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

—বৈসাদৃশ্য—

বসন্ত—	পরজ—
(১) জাতি সম্পূর্ণ—মতান্তরে ষাড়ব।	(১) জাতি—সম্পূর্ণ।
(২) পূর্বে কেহ কেহ প বর্জিত করিয়া শুদ্ধ ধ ব্যবহার করিতেন।	(২) বর্ত্তমানে সকলেই কোমল ধ ব্যবহার করেন।
(৩) 'গ ম গ' স্বর-সমূহ এই রাগে অধিক ব্যবহৃত হয়।	(৩) 'গ ম গ' স্বর-সমূহ এই রাগে অধিক ব্যবহৃত হয়।
(৪) এই রাগের প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর।	(৪) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।
(৫) এই রাগকে 'ঋতু-রাগ' বলা হয়।	(৫) এই রাগ 'ঋতু-রাগ' নহে।

———

মিয়ামল্লার — বাহার

—সাদৃশ্য—

(১) উভয় রাগই কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই দুই নি (কোমল ও শুদ্ধ), কোমল গ এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

(৩) উভয় রাগেই অবরোহে ধ বর্জিত।

(৪) উভয় রাগেরই গাহিবার সময় মধ্যরাত্রি।

(৫) উভয় রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।

—বৈসাদৃশ্য—

মিয়ামল্লার—	বাহার —
(১) জাতি সম্পূর্ণ —ষাড়ব।	(১) জাতি ষাডব—ষাড়ব।
(২) বাদী ম ও সম্বাদী সা— মতান্তরে সা ও প।	(২) সর্ববাদী সম্মতভাবে বাদী ম ও সম্বাদী সা।
(৩) এই রাগে সমস্ত গায়কই কোমল গ ও শুদ্ধ ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন।	(৩) এই রাগে কোনও কোনও খেয়াল গায়ক দ্রুত তান করিবার সময় উভয় গান্ধার ও উভয় ধৈবত ব্যবহার করিয়া থাকেন।
(৪) আরোহে কোনও স্বর বর্জিত হয় না।	(৪) আরোহে রে বর্জিত।
(৫) এই রাগেব আলাপ মন্দ্র সপ্তক অধিক হইয়া থাকে।	(৫) এই রাগের আলাপ মধ্য স্থানে অধিক হইয়া থাকে।
(৬) এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর।	(৬) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।
(৭) এই রাগে বহু গানে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা আছে এবং বর্ষা ঋতুতে অধিক গাওয়া হইয়া থাকে।	(৭) এই রাগের বহু গানে বসন্ত ঋতুর বর্ণনা দেখা যায়।
(৮) বর্ষা ঋতুর যে কোনও সময়ে এই রাগ গাওয়া যাইতে পারে।	(৮) বসন্ত ঋতুর যে কোনও সময়ে এই রাগ গাওয়া যাইতে পারে

দরবারী—আড়ানা

—সাদৃশ্য—

(১) উভয় রাগই আশাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) উভয় রাগেই কোমল গ, ধ, নি এবং শুদ্ধ অবশিষ্ট স্বর ব্যবহৃত হয়।

(৩) উভয় রাগেই অবরোহে ধ বর্জিত।

(৪) উভয় রাগেই অবরোহে গ বক্র।

(৫) উভয় রাগেই গ দুর্বল।

—বৈসাদৃশ্য—

দরবারী	আড়ানা
(১) জাতি সম্পূর্ণ—ষাড়ব।	(১) জাতি ষাড়ব—ষাড়ব।
(২) গাহিবার সময়—মধ্যরাত্রি।	(২) গাহিবার সময়—রাত্রি-তৃতীয় প্রহর।
(৩) বাদী রে ও সম্বাদী প।	(৩) বাদী সা ও সম্বাদী প।
(৪) এই রাগ মন্দ্রসপ্তকে অধিক গাওয়া হয় এবং মন্দ্রস্থানে গমকের প্রয়োগ অধিক হইয়া থাকে।	(৪) এই রাগ মধ্য ও তার সপ্তকে অধিক গাওয়া হয়।
(৫) এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর।	(৫) এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল।
(৬) শুদ্ধ নি কখনও ব্যবহৃত হয় না।	(৬) আরোহে শুদ্ধ নি ব্যবহৃত হয়।

———

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর ভারতীয় কতিপয় তাল

কাহারবা—৪ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪
ঠেকা—	ধাগ	ধিন্	নাগ	তিন্
	×		০	

রূপক তাল—৭ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঠেকা—	তিন্	তিন্	না	ধি	না	ধি	না
	×			২		৩	

কাহারবা—৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা—	ধা	গে	তে	টে	না	গে	ধি	ন্
	×				০			

রুদ্র তাল—১১ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ঠেকা—	ধি	না	ধি	না	তা	তি	না	ক	ত্তা	:ধি	না
	×	২	০	৩	৪	৫	০	৬	৭	৮	০

বিক্রম তাল—১২ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ঠেকা—	ধা	S	ধি	ত্তা	S	ক	S	ত্তা
	×		২			০		

৯ ১০ ১১ ১২
তিটে কতা গদি ঘেনে

গজঝম্পা তাল ১৫ মাত্রা

মাত্রা— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ঠেকা— ধা ধিন্ নক্ তক্ ধা ধিন্ নক্ তক
× ২

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
ধিন্ নক্ তক্ কিট্ তক্ গদি গিন
০ ৩

সোয়ারী তাল—১৫ মাত্রা

মাত্রা— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ঠেকা— ধিন্ তেটেকেটে ধিনা কৎ ধিধি নাধি ধিনা
× ২ ০

৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
তিনা তিনা তৃক্তুনা কিড়নগ কত্তা ধিধি নাধি ধিনা
৩ ০ ৪ ০

শিখর তাল—১৭ মাত্রা

মাত্রা— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ঠেকা ধা তৃক্ ধিন নক্ থুং গা ধিন্ নক্ ধুম্ কিট্ তক্ ধেৎ
× ২

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭
ধা তিট কতা গদি ঘেনে
৩ ৪

বিষ্ণু তাল—১৭ মাত্রা

মাত্রা -	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঠেকা -	ধিন্	না	ধিন্	ধিনা	না	ধিন্	তৃক্	ধি	না
	X		২			৩			

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ধিন্	ধিন্	না	ধিন্	ধি	না	ধি	না
৪				০			

লক্ষ্মী তাল—১৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ঠেকা—	ধিন্	তেৎ	ধেৎ	ধেৎ	দিন্	তা	তিট	কৎ	ধা
	X	২	৩	০	৪	৫	৬	০	৭

১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
দিন্	তা	ধুম	কিট	ধুমা	কিট	কৎ	গদি	ঘেনে
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	০

মত্ত তাল—১৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ঠেকা—	ধা	ঽ	ঘি	ড়	ন	ক	ঘি	ড়	ন	ক
	X		০		২		৩		০	

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
তি	ট	ক	তা	গ	দি	ঘি	ন
৪		৫		৬		০	

ব্রহ্ম তাল— ২৮ মাত্রা

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ঠেকা—	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	তৃক্	ধিন্	ধিন্	ধা	তি	তি
	X		০		১		৩		০	

১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
না	তি	তি	না	তি	না	তু	না	ক	ত্তা
৪		৫		৬		০		৭	

২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
ধি	না	ধাগে	নেধা	তৃক্	ধি	গদি	ঘেনে
৮		৯		১০		০	

পঃ ভাতখণ্ডেজীর মতে ব্রহ্মতালের বোল নিম্নে প্রদত্ত হইল :

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ঠেকা—	ধা	S	ধি	ন	ন	ক	ধি	ন	ন	ক	ধি	S
	X	০		২		৩		০			৪	

মাত্রা—	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ঠেকা—	দ্দি	S	দ্দি	ন	ন	ক	ধি	S
	৫		৬		০		৭	

মাত্রা—	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
ঠেকা—	দ্দি	ন	ন	ধি	ন	ন	ত	ক
	৮		৯		১০		০	

———

দক্ষিণ ভারতীয় তাল পদ্ধতি

দক্ষিণ পদ্ধতিতে মুখ্য ৭টি তাল আছে। যথা—

(১) ধ্রুব তাল—১৪ মাত্রা। (২) মঠ তাল—১০ মাত্রা।

(৩) রূপক তাল—৬ মাত্রা। (৪) ঝম্প তাল—৭ মাত্রা।

(৫) ত্রিপুট তাল - ৮ মাত্রা। (৬) অঠ তাল—১২ মাত্রা।

(৭) এক তাল—৪ মাত্রা।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি তালের ৫টি করিয়া জাতি আছে। যথা-চতস্রজাতি, তিস্রজাতি, মিশ্রজাতি, খণ্ডজাতি ও সঙ্কীর্ণজাতি।

তালের নাম	চতস্রজাতি	তিস্রজাতি	মিশ্রজাতি	খণ্ডজাতি	সঙ্কীর্ণজাতি
১। ধ্রুব তাল	৪.২.৪ ৪	৩ ২.৩.৩	৭.২.৭.৭	৫.২.৫.৫	৯.২.৯.৯
২। মঠ তাল	৪.২.৪	৩.২.৩	৭.২ ৭	৫.২.৫	৯.২.৯
৩। রূপক তাল	৪ ২	৩ ২	৭ ২	৫ ২	৯.২
৪। ঝম্প তাল	৪.১.২	৩ ১.২	৭ ১.২	৫.১.২	৯.১ ২
৫। ত্রিপুট তাল	৪.২.২	৩ ২.২	৭.২.২	৫.২.২	৯ ২.২
৬। অঠ তাল	৪.৪.২.২	৩ ৩ ২.২	৭.৭.২.২	৫.৫.২.২	৯.৯ ২.২
৭। এক তাল	৪	৩	৭	৫	৯

দক্ষিণ পদ্ধতির তাল লিখিবার সময় ৬ প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যথা :—

(১)	বিরাম	=	‿	=	১ মাত্রা।
(২)	দ্রুত	=	o	=	২ মাত্রা।
(৩)	লঘু	=	I	=	৪ মাত্রা।
(৪)	গুরু	=	S	=	৮ মাত্রা।
(৫)	প্লুত	=	३	=	১২ মাত্রা
(৬)	কাকপদ	=	+	=	১৬ মাত্রা

উপরোক্ত ৬টি চিহ্নের ভিতর লঘুর চিহ্নটি বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। কারণ জাতি ভেদে লঘুর সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয়।

চতস্রজাতিতে	লঘুর সংখ্যা	৪ মাত্রা।
তিস্রজাতিতে	লঘুর সংখ্যা	৩ মাত্রা।
মিশ্রজাতিতে	লঘুর সংখ্যা	৭ মাত্রা।
খণ্ডজাতিতে	লঘুর সংখ্যা	৫ মাত্রা।
সংকীর্ণজাতিতে	লঘুর সংখ্যা	৯ মাত্রা।

নিম্নলিখিত চিহ্ন সমূহের দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ তাল চিহ্নিত করিয়াছেন।

১।	ধ্রুব তাল—	I 0 I I	=	১৪ মাত্রা।
২।	মঠ তাল—	I 0 I	=	১০ মাত্রা।
৩।	রূপক তাল—	I 0	=	৬ মাত্রা।
৪।	ঝম্প তাল—	I ‿ 0	=	৭ মাত্রা।
৫।	ত্রিপুট তাল—	I 00	=	৮ মাত্রা।
৬।	অঠ তাল—	I I 00	=	১২ মাত্রা।
৭।	এক তাল—	I	=	৪ মাত্রা।

দক্ষিণ পদ্ধতির মুখ্য ৭টি তাল হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে চতস্রজাতিতে লিখিত হইলে নিম্নরূপ হইবে।

(১) ধ্রুব তাল—১৪ মাত্রা (I 0 I I) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
তাল চিহ্ন—	X				২		৩				৪			

(২) মঠ তাল—১০ মাত্রা (I0I) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তাল চিহ্ন—	X				২		৩			

(৩) রূপক তাল—৬ মাত্রা (10) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬
তাল চিহ্ন	×				২	

(৪) ঝম্প তাল—৭ মাত্রা (I ◡ 0) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তাল চিহ্ন –	×				২	৩	

(৫) ত্রিপুট তাল—৮ মাত্রা (1 0 0) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
তাল চিহ্ন—	×				২		৩	

(৬) অঠ তাল—১২ মাত্রা (11000) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তাল চিহ্ন —	×				২				৩		৪	

এক তাল—৪ মাত্রা (I) চতস্রজাতি।

মাত্রা—	১	২	৩	৪
তাল চিহ্ন—	×			

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা-সংগীতের ক্রমবিকাশ

আদিকাল হইতে আধুনিককাল পর্য্যন্ত মানবসভ্যতা যেমন সহস্র স্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে সংগীতও তেমনি আর্চিক, গাথিক, সামিক, বৈদিক, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বহু স্তর অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানযুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। যেমন তার বহু প্রদেশ, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি, তেমন সংগীতও তার বহু ও বিচিত্র। বাংলা ভারতেরই একটি প্রদেশ যার ভাষা বাংলা—ভারতের অন্যতম ভাষা। এই ভাষায় রচিত বাংলার নিজস্ব যে গান, তাহাই "বাংলা গান"। যে কীর্ত্তন সংগীত জগতে কাব্য রসে ও সুর সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় তাহা এই বাংলারই সৃষ্টি ও নিজস্ব সম্পদ। এই বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি আরো বহু আঞ্চলিক গান নিয়া বাংলার এই সংগীত ধারা আপন বৈশিষ্ট্যে যে কোন প্রদেশের আঞ্চলিক সংগীত হইতে সমুজ্জ্বল।

বাংলাগান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাহার প্রথম সৃষ্টির কাল ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। সংক্ষিপ্তভাবে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

সংগীতধারাকে তিনটি প্রধানযুগে বিভাগক্রমে গ্রহণ করিলে প্রাচীন (বৈদিক) মধ্য ও বর্ত্তমানযুগকেই আমরা বুঝিয়া থাকি। খ্রীষ্টীয় ৯ম হইতে প্রায় ১৫শ শতক পর্য্যন্ত চর্য্যা পদ, গীত-গোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও মঙ্গল-গীতির কাল। এই কালকে "বাংলা গান" সৃষ্টির আদিকাল বলা যায়।

শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির আবির্ভাব কালই "বাংলা গানের" মধ্যযুগ এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, দশরথি রায় প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল পর্য্যন্ত যুগকে আধুনিকযুগ বলিয়া ধরা যায়।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে আধুনিকযুগের বাংলা গানই প্রচলিত রহিয়াছে। আদিযুগের চর্য্যা-গান ও মঙ্গল-গীতি আর প্রচলিত নাই এবং লুপ্ত হইয়াছে বলা যায়। কীর্ত্তনগান প্রচলিত থাকিলেও তার পূর্ববতনযুগের আদি রূপটীর প্রচলন, তেমন দেখা যায় না।

এখন এই আধুনিকযুগের বাংলা গানে একটি সীমারেখা টানিয়া কিছু গান পূর্বতন ও কিছু গান সাম্প্রতিক পর্যায়ভুক্ত করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এই দুইটি পর্য্যায়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপন করা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্ত্তী রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামনিধি এবং সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সকল গীতিকবির গানকে আধুনিক পর্য্যায়ভুক্ত বলা যায়।

বর্ত্তমানযুগ বাংলাগানের বৈচিত্র্য লইয়া আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই এখানে তাহা আলোচ্য নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা গানের ক্রমবিকাশ কি ভাবে হইল ও বাংলাগান কি পর্য্যায়ে ছিল সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাই মাত্র আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীন বাংলার সংগীত ও সংস্কৃতি পৌনড্রবর্দ্ধন, বরেন্দ্র ও রাঢ়ভূমি এই তিনটি জনপদ লইয়া গড়িয়া ওঠে। ঐ সময়ে বাংলাদেশ নানা প্রকার সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র রূপে খ্যাত ছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির আগমনে বাংলার সংস্কৃতি ও সংগীত সমন্বয়ের মহত্ব মাধুর্য্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বাংলার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যবসায়, বাণিজ্য ও পর্য্যটন উপলক্ষ্যে

বিদেশীদের গমনাগমন আরো বর্দ্ধিত হইয়া বাংলার সহিত সাংস্কৃতিক আদান প্রদান আরো নিবিড়তর হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে বাংলার সংস্কৃতি ও সংগীতকে বহন করিয়া বহু বাঙ্গালী বহু দূর দেশ পর্য্যটন করিয়া বাংলার সহিত বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র রচনা করিয়াছে। তৎকালে সর্ব-ভারতে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির স্থান খুবই মর্য্যাদাপূর্ণ ছিল।

মৌর্য্যযুগ হইতে গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত বাংলায় সাংস্কৃতিক অনুশীলন সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছে। সর্বযুগেই রাগ-সংগীত ও দেশী সংগীত যেমন পাশাপাশি চলিয়াছে, কথিত যুগেও রাগ-সংগীত ও দেশী সংগীত পাশাপাশি চলিয়াছে। বাংলাদেশের আদিম সভ্যতার সঙ্গে আর্য্য-সভ্যতার যোগাযোগ এই সময়েই বাংলায় স্থিতি লাভ করে ও আর্য্য সংস্কৃতিকে বাংলা আত্মস্থ করিয়া লয়।

এই সময়ে আদিবাসী ও শবরদের দ্বারা 'শবরোৎসব' ও অন্যান্য উৎসব নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পালিত হইত। রাজারাজড়াদের দরবারে বিশিষ্ট কলাবন্তদের দ্বারা রাগ সংগীতের চর্চ্চা হইত। আদিবাসীদের কিছু সংগীত এই সময়ে রাগ পর্য্যায়ে উন্নীত হয় ও রাগ-সংগীতের প্রভাবে দেশী সংগীতও ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হইতে আরম্ভ করে।

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্য্যা-গীতি, নাথ-গীতি, চাচর ও হোলি প্রভৃতি কতগুলি গীত-রীতির প্রচলন বাংলা দেশে ছিল যাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত নাই। "চর্য্যাপদ"কেই বাংলা ভাষায় রচিত আদি বা প্রাচীনতম বাংলা গান বলা যায়—যাহা ক্রমবিকাশের পথে বর্ত্তমান যুগে পৌঁছিয়াছে সমৃদ্ধতর রূপে। জয়দেব রচিত "গীতগোবিন্দ" (জয়দেব পদাবলী মূলতঃ সংস্কৃত-সমুদ্ভব সাহিত্য হইলেও ভাষা, ভাব ও ছন্দের দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, সে অনুযায়ী পরবর্ত্তীকালের বাংলা বৈষ্ণবপদাবলী গানের জনক রূপে স্বীকৃত) ও চণ্ডীদাস রচিত "কৃষ্ণ-

কীর্ত্তন" হওয়ার পর বাংলা গান আরো বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও অধিকতর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হয়।

গীতগোবিন্দ ও মঙ্গল-কাব্য সংশ্লিষ্ট গান রাগ-সংগীত হিসাবেই গাওয়া হইত, সেই কারণে রাগ-সংগীতের প্রভাবই সেই যুগে বাংলাগানের উপর বেশী ছিল।

পালযুগে পালরাজাদের কীর্তিগাথা লইয়া অনেক দেশী সংগীত রচিত হয় এবং বহুকাল বাংলাদেশে ঐ গান প্রচলিত ছিল। দেশী-সংগীতও সেই সময় হইতে সমৃদ্ধতর হইতে থাকে।

মধ্যযুগীয় গীতরীতিগুলি সম্বন্ধে এখন সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।



চর্য্যাপদ

প্রাচীনযুগে 'পদ' কথাটি সর্বপ্রকার সংগীতেই ব্যবহৃত হইত, এবং গান মাত্রই ছিল 'প্রবন্ধ'। তখন মোট ৩৬টি ধারার প্রবন্ধের প্রচলন ছিল, তার মধ্যে 'চর্য্যাপদ' একটি ধারা তারাবলী শ্রেণীর অন্তর্গত। চর্য্যাপদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে স্বভাবতঃই প্রবন্ধের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে কাজেই ঐ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রবন্ধগীতের শ্রেণী বিভাগ ছিল পাঁচ প্রকার ও বিভিন্ন প্রকারের ৬টি অঙ্গ গীতরীতিরূপে ব্যবহৃত হইত; গাওয়ার পদ্ধতি ছিল ধ্রুপদের ন্যায়।

ঐ ছয়টি অঙ্গ যথা :—

১।	স্বর—	অর্থাৎ	(স র গ ম)
২।	বিরুদ—	,,	(স্তুতিবাচক ধ্বনি)
৩।	পদ—	,,	(বাক্য বা বাণী)
৪।	তেনক—	,,	(মঙ্গলবাচক ধ্বনি)
৫।	পাট—	,,	(যন্ত্রের বোল)
৬।	তাল—	,,	(লয় সহ গতি)

সর্বোচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ ছিল পূর্বে বর্ণিত ঐ মোট ৬টি অঙ্গযুক্ত যাহাকে বলা হইত 'মেদিনী'।

পাঁচ অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধের নাম ছিল 'আনন্দিনী'; চার অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধের নাম ছিল 'দীপনী', তিন অঙ্গযুক্ত 'ভাবনী' ও দুই অঙ্গযুক্ত 'তারাবলী'।

এই 'তারাবলী' শ্রেণীর গানই ছিল 'চর্য্যাপদ'। দুইটি অঙ্গ পদ ও তালবিশিষ্ট। এই গান ছিল অধ্যাত্মবিষয়ক ও বীররসাত্মক। সমবেত ভাবে এই গান গাওয়া হইত ও প্রধান পদটি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হইত।

প্রবন্ধগীতের মধ্যে এই গান উচ্চ শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত ছিল না। চর্য্যাগানে রাগের উল্লেখ থাকিলেও সংগীত-শাস্ত্রানুযায়ী তাদের প্রামাণ্য পরিচয় পাওয়া যায় না। চর্য্যাপদ দেশী-সংগীতের পর্য্যায়েই ছিল—এইরূপই অনুমিত হয়।

এই গান মিলিতভাবে গাওয়া হইত এবং কীর্তনগানের সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য ছিল বলিয়া কেউ কেউ অনুমান করেন, কিন্তু কীর্তনগানের সমুন্নতির কাল আরম্ভ হয় প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের -কীর্তন রচিত হওয়ার পর হইতে।

মঙ্গল-কাব্য

দেবতাগণের আখ্যানভাগ ও পৌরাণিক কাহিনী লইয়া যে সকল মঙ্গলবিধায়ক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। এই মঙ্গল-কাব্যের যুগ বাংলাদেশে প্রায় চারশত বৎসর-ব্যাপী ছিল।

মঙ্গল-কাব্য রাগ-সংগীত রূপেই গাওয়া হইত এবং তত, আনদ্ধ, শুষির, ঘন প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রই গানে ব্যবহৃত হইত। সেই সময় সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা রচনা হইত ও গীত, বাদ্য ও নৃত্যের অনুষ্ঠান হইত। বাদ্যের মধ্যে প্রধান ছিল—বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, কাঁসর, করতাল, ঢাক, ঢোল ও মৃৎভাণ্ড।

বোট্ট বা কৌশিক রাগে—নিঃসারু তালে বিলম্বিত লয়ে মঙ্গলাচার গীত গাওয়া হইত। গীতরূপের তিনটি বিভাগ ছিল। আরম্ভের অংশকে বলা হইত উদগ্রাহ, মাঝের অংশ ধ্রুব ও শেষের অংশ আভোগ। উদগ্রাহ ও ধ্রুব অংশ সম্পূর্ণ গানে আবৃত্তি করা হইত ও আভোগ অংশে কিছু গান ও কিছু পাঠ ছিল।

মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান তিনটি :—

(১) মনসামঙ্গল (২) চণ্ডীমঙ্গল (৩) ধর্মমঙ্গল।

পৌরাণিক মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধাম তিনটি :—

(১) ভবানীমঙ্গল (২) সূর্য্যমঙ্গল (৩) অন্নদামঙ্গল।

বৈষ্ণব বিরচিত মানবিক মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে প্রধান দুইটি :—

(১) চৈতন্যভাগবত (২) চৈতন্যমঙ্গল।

মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত কতিপয় বাদ্যযন্ত্র যথা :—

দুন্দুভি, ডিণ্ডিম, মৃদঙ্গ, সানাই, শঙ্খ, করতাল, রবাব, সপ্তস্বরা, মুহরী, ঘণ্টা, শিঙ্গা, ঝাঁঝর, কপিলাস ও ধমক ইত্যাদি।

কৃষ্ণলীলা ও কীর্ত্তন

মহাকাব্য 'মহাভারত' রচনার পর মহর্ষি ব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করিয়া কৃষ্ণলীলা প্রচার করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই কৃষ্ণলীলা গানের প্রচার আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনের আদি কথা এই—

মঙ্গলকাব্যের যুগে কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন শব্দের উল্লেখ থাকিলেও মধ্য যুগের মত সমবেত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে গাওয়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কীর্ত্তন রচিত হওয়ার পর 'কীর্ত্তন' প্রচার সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হয় ও ক্রমে ক্রমে সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রমুখ মহাজনগণ দ্বারা কীর্ত্তনাঙ্গ গানের যথেষ্ট পুষ্টিবিধান হয় ও চৈতন্যযুগে আসিয়া এই গান সর্বশ্রীমণ্ডিত হইয়া সঙ্গীতের সভায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে কিছুকাল কীর্ত্তনের গতি স্তব্ধ থাকিলেও ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা সন্তোষ ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতরীতে যে বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহ্বান করেন সেই সময় হইতে পূর্ণ বেগে আবার কীর্ত্তনের প্রচার আরম্ভ হয়। এই কীর্ত্তনকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনবাসী শ্রীজীব গোস্বামী স্বয়ং শ্রীনরোত্তম দাস, শ্রী-শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীশ্যামানন্দ এই তিনজন গোস্বামী সন্তানকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া তোলেন এবং দিল্লীর দরবারের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগুণীদের দ্বারা উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষাদান করান।

ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষান্তে বিশেষ পারদর্শী হওয়ার পর এই তিনজন গোস্বামী সন্তানই বাংলার বিভিন্ন পরগণায় বসতি স্থাপন করতঃ কীর্ত্তনের প্রচার ও উন্নতি সাধনের ব্রত গ্রহণ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দেশানুযায়ী শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গড়েরহাটি পরগণায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য মনোহরসাহী পরগণায় ও শ্রীশ্যামানন্দ

রাণীহাটি পরগণায় বসতি স্থাপন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্ত্তন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলাদেশে বর্ত্তমানে গরাণহাটি মনোহরসাহী ও রেণেটি নামে কীর্ত্তনের যে তিনটি বিশেষ ধারা বা ঘরানার নাম শোনা যায় পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ তিন জন গোস্বামী হইতেই তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে।

"খেতরীর" উৎসবে এই গোস্বামীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সময় হইতেই আবার কীর্ত্তনের নব জাগরণের অগ্রগতির সূচনা হয় এবং উহা অদ্যাবধি অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে।

সংগীত দর্শিকা প্রথম ভাগে কীর্ত্তনের গীতরীতি ও ধারা সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা থাকায় এখানে পুনরুল্লেখের আবশ্যকতা নাই।

এখানে একটু লক্ষ্য করার বিষয় যে, যে তিনজন গোস্বামী এই তিনটি ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের তিন জনই উচ্চাঙ্গ রাগ সংগীতের ধারক ছিলেন, এবং তাঁহারা কীর্ত্তন গানে ধ্রুপদের গীত-ভঙ্গিকেই নবতর রূপে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা না থাকিলে কীর্ত্তনের এই অনির্বচনীয় রূপটির প্রকাশ হইত না। কীর্ত্তনগান আজও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা রূপেই চলিয়া আসিতেছে।

ইদানীং অপরাপর সঙ্গীতকে যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত করার চেষ্টা চলিতেছে কীর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ এমন কোন চেষ্টা লক্ষিত হয় না। যদি এখন হইতে কীর্ত্তনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্বরলিপি দ্বারা সংরক্ষণের চেষ্টা না চলে তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার প্রকৃত রূপটির বিকৃতি ঘটারই আশঙ্কা অধিক। কীর্ত্তনের অনুশীলনকারী কণ্ঠ সাধনায় উচ্চস্তরের সাধনসম্পন্ন না হইলে সেই কণ্ঠে কীর্ত্তনের প্রকৃষ্ট রূপটি কিছুতেই ফুটিতে পারে না।

পাঁচশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও উচ্চশ্রেণীর কীর্ত্তনীয়াগণ যে-স্তরের কীর্ত্তনগান পরিবেশন করিতেন এবং শ্রুতির যে বিস্ময়কর প্রয়োগ করিতেন বর্ত্তমানে তেমন কীর্ত্তন বড় আর শোনা যায় না।

কাজেই এখন হইতে দৃঢ়ভাবে কীর্ত্তনের প্রকৃত রূপটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণের চেষ্টা না করিলে কীর্ত্তনের পূর্ব গৌরব অচিরেই ম্লান হইয়া পড়িবে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

মধ্যযুগে সাধন-সংগীত ও বাউল-সংগীত

মধ্য-যুগে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব ও মধ্য ভারতে নানক, কবীর, তুলসীদাস ও দাদু প্রভৃতি ভক্ত কবিদের আবির্ভাব ঘটে। বাংলায় কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে উক্ত ভক্ত কবিদের সাধন-সংগীতের স্রোতও প্রবাহিত হইতে থাকে। বাংলায়ও তৎকালে নূতন একটি সাধন-সংগীতের ধারা প্রবর্ত্তিত হয়, রাগ ও দেশী-সংগীতের মিশ্রিত রূপ লইয়া এই সময় শিব, শক্তি ও হরিবিষয়ক বহু সাধন-সংগীত রচিত হয়।

মধ্য যুগেই বাংলাদেশে নূতন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ইহার নাম বাউল সম্প্রদায়। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবই এই ধর্মসম্প্রদায়ের উপর ছিল সর্বাধিক।

এই সম্প্রদায় জাতি বিচার মানিত না ও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই সাধন গ্রহণ করিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুদের বলা হইত বাউল ও মুসলমানদের বলা হইত আওল, দরবেশ, পীর বা ফকির।

বাউলদের গুরুবাদ ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব লইয়া বাংলাদেশে তখন আর একটি নূতন সঙ্গীত ধারার উদ্ভব হয়, যার নাম বাউল সঙ্গীত ; দেশী সুরই যার অবলম্বন। বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতিতে "বাউল গানের" একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। কিন্তু মহাজন স্থানীয় যে সব ব্যক্তি বাউল গানের স্রষ্টা ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দেহরক্ষা করিয়াছেন এবং এই সম্প্রদায়ও ক্রমে অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। সেই কারণেই বাউল গানের অগ্রগতি বা পুষ্টিও এখানে আসিয়াই স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে বলা যায়।

যে সকল তত্ত্বদর্শী গুরুস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় সংগীতের মাধ্যমে প্রচার করিতেন, ঐ সম্প্রদায়ে বর্ত্তমানে তেমন কোন "গুরুর" আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কাজেই বাউল গানের চরমবিকাশ ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা যায়, এবং এই গানের আর কোন অগ্রগতির আশা নাই মনে করা যায়। বাউল সংগীতের অনুকরণে হয়ত বহু গান রচিত হইবে বা হইয়াছে কিন্তু যাহারা ঐ ভাবের ভাবুক বা সাধন-সম্পন্ন নন তাঁহাদের রচনা যতই উন্নত শ্রেণীর হউক না কেন সে গান সাধকদের রচনার পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিচার করা বোধহয় সঙ্গত হইবে না।

এই মধ্য যুগে সাধক-সংগীত ও বাউল-সংগীত ভিন্ন আরো কতকগুলি আঞ্চলিক বা পল্লী-সংগীতের ধারার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়; শ্রমজীবী কৃষক মাঝিমাল্লা ও আদিবাসী সাঁওতালদের ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি সারি ও ঝুমুর ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের লোক-সংগীত প্রচার লাভ করে। এতদ্ভিন্ন নানা দেব-দেবীবিষয়ক লোক-সংগীতও বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত হইয়া প্রসার লাভ করে। যথা:— গম্ভীরা, ভাদু ইত্যাদি। বিচিত্র রস-সম্ভার লইয়া এই জাতীয় গানের আবির্ভাবে বাংলার আঞ্চলিক-সংগীত এই সময়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও রসপুষ্ট হইয়া উঠে।

বিভিন্ন প্রকারের এই সকল আঞ্চলিক-সংগীতের পরিচয় "সংগীত-দর্শিকা" প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এখানে আর অধিক আলোচনা করা হইল না।

পাঁচালী

চৈতন্য-যুগে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে বাংলাদেশে পাঁচালী নামে আর একটি গীতিধারার উদ্ভব হয়। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে "পঞ্চতালেশ্বর" নামে এক প্রকার গীত বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, যাহার পাঁচটি পদ পটহ, হুড়ুক্কা, শঙ্খ ও কাঁসি প্রভৃতি

বিভিন্ন বাদ্য সংযোগে গাওয়া হইত। প্রথম পদটিতে রাগালাপ করা হইত এবং তাল থাকিত না। এই গান ছিল শৃঙ্গার ও বীর রসাত্মক। এই "পঞ্চতালেশ্বর" অষ্টাদশ শতকের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায় ও পাঁচালী নাম গ্রহণ পুর্ব্বক নূতন এক গীতরীতি অবলম্বন করে। পাঁচালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কেউ কেউ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন।

আবার কেউ বলেন যে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, ভারত-চন্দ্র রচিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সকলই পাঁচালী নামে অভিহিত। এই গানে "পদকর্ত্তার" পদচালনা পুর্ব্বক আসরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বর্ণনীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা ও গান করার রীতি হইতে "পাঁচালী" কথার উদ্ভব হইয়াছে।

ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে—"পঞ্চতালেশ্বরের" নামেই মাত্র উল্লেখ আছে দেখা যায়, কিন্তু বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐ গ্রন্থে "পাঁচালীকে" ক্ষুদ্র গীতের পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্রগীত ছিল চার প্রকার যথা—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুপদ ও পাঁচালী।

এই "পাঁচালীগান" দাশরথি রায়ের পূর্ব পর্য্যন্ত ছড়াগানের আকারে ছিল। কিন্তু দাশরথির কৃতিত্বে এই গানে নূতনভাবে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে তাহা রাগসংগীতের স্পর্শে আসিয়া কাব্য পর্য্যায়ে উন্নীত হয়। তিনি পাঁচালীগানে আবার নূতন আবেদন জাগাইয়া তোলেন ও ললিত, বিভাস, সিন্ধুভৈরবী প্রভৃতি রাগে এবং ঝাঁপতালে ও যৎ প্রভৃতি তালে বহু গান রচনা করিয়া সুনিপুন-ভাবে টপ্পাঙ্গের প্রয়োগে পাঁচালীর অবয়বকে সবিশেষ মাধুর্য্য মণ্ডিত করিয়া তোলেন।

যে অর্থে শ্রীচৈতন্য দেবকে কীর্ত্তনের স্রষ্টা বলা যায় সেই অর্থে দাশরথিকেও "পাঁচালীর" জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অপর কেহই পাঁচালী গানে দাশরথি রায়ের সমান কৃতিত্ব দাবী

করিতে পারেন না। এক কালে পাঁচালী গানে সারা বাংলাদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল ও বাংলার সংগীতে ঐ গানের বিশেষ গৌরবময় স্থান ছিল। বর্ত্তমানে পাঁচালী গান প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাছাড়া ধর্ম্মপ্রাণ শ্রোতার অভাবের কারণে এই জাতীয় সংগীত ক্রমেই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে।

নাচাড়ি

নাচাড়ি পাঁচালীরই "নৃত্য" সম্বলিত ভিন্ন একটি রূপ। গায়ক বা ব্যাখ্যাকর্ত্তা ছন্দবিশেষ বর্ণনা কালে নৃত্য দ্বারা প্রকৃত ভাবকে বলিষ্ঠ বা সরস করিয়া তুলিতেন। এই কারণ হইতেই "নাচাড়ি" নামের উদ্ভব হয়। পাঁচালীকার পদচালনা করিয়া বর্ণনীয় বিষয় ব্যাখ্যা করিলেও নৃত্যের সহিত করিতেন না, কিন্তু নাচাড়িগানে পদ চালনা ও নৃত্য উভয়ই ছিল। পৌরাণিক কাহিনীই ছিল পাঁচালী ও নাচাড়ির একমাত্র অবলম্বন।

দাঁড়াকবি

দাঁড়াকবি পাঁচালীরই আর একটি রূপ এবং পৌরাণিক কাহিনীই তাঁরও অবলম্বন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত গায়কগণ একসঙ্গে দাঁড়াইয়া সমবেতভাবে গান করিতেন। এই কারণেই এই সম্প্রদায়ের নাম হয় দাঁড়াকবি। ইহাতে দুইটি পক্ষ মুখোমুখী দাঁড়াইয়া গান করিত। এই দুইজন কবিয়াল যে কাহিনী অবলম্বনে গান করিত সেই কাহিনীর দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিজ নিজ চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার জন্য তর্ক যুক্তি ও বিচারে এক জন অপর জনকে পরাজিত করিয়া আসরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেন। ইহারা সাধারণতঃই স্বভাব কবি, সুবক্তা ও সুগায়ক পর্য্যায়ের পণ্ডিত ব্যক্তি হইতেন, এবং তাঁদের দ্বন্দ্ব ও উপস্থিত মত কবিতা গানেই হইত, এই জন্যই তাঁহাদিগকে বলা হইত "কবিয়াল"। এঁরা

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইতেন। চর্চা না থাকার ফলে অধুনা এই গানও লুপ্তপ্রায়। রাম বসু, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি কবিয়ালগণ বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈঠকী গান

যে সকল পাঁচালীগান রাগের প্রভাবে রচিত হইয়া কাব্য-সংগীতের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল সেই সকল গানও উচ্চাঙ্গ রাগ-সংগীত উচ্চ স্তরের কলাবন্তদের দ্বারা সংগীতানুরাগীদের বৈঠকঘরে বা মজ্‌লিসে গাওয়া হইত। ইহা হইতেই বৈঠকী গান নামের উৎপত্তি হয়। রাজা মহারাজা ও জমিদার শ্রেণীর সংগীতানুরাগীরাই এই গানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

অধুনা সেই স্তরের শ্রোতারা অধিকাংশই আপন আপন মর্য্যাদা হইতে নানা কারণে বিচ্যুত হইয়া পড়ায় বৈঠকে বা মজলিসে গানের আসর উঠিয়াই গিয়াছে বলা যায়।

ঐ বৈঠকগানেরই পরবর্ত্তী রূপ হিসাবে উচ্চাঙ্গ-সংগীত হইতে আরম্ভ করিয়া দেশী-সংগীত পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের সংগীত, নৃত্য ও নানা প্রকারের বাদ্যানুষ্ঠান সংগীত-সম্মেলন বা মিউজিক কন্‌ফারেন্স-এ ইদানীং আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈঠকীগান পূর্বে সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত ছিল না। আসর যিনি আহ্বান করিতেন কেবল তাঁহারই নিকট বন্ধু আত্মীয়ের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমানে উপযুক্ত দর্শনীর বিনিময়ে যে কেহই ঐ রূপ কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে পারেন। কাজেই কথিত "বৈঠকগান" লুপ্ত হইলেও বর্ত্তমানে ইহা বরঞ্চ অধিক শ্রীসম্পন্ন হইয়া ভিন্ন একটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলা যায়।

কথকতা

রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রোতারা বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও শ্রদ্ধার

সহিত শুনিতেন। এই পাঠ ও ব্যাখ্যা করাকে বলা হইত "কথকতা" আর যিনি পাঠ করিতেন তাঁহাকে বলা হইত 'কথক'। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ হইতেই সম্ভবতঃ কথকতা আরম্ভ হয়।

প্রাচীন যুগে এই "কথকতা" শুধু মাত্র আবৃত্তিতেই নিবদ্ধ ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই ধারার প্রথম পরিবর্ত্তন সাধন করেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কথক পণ্ডিত গদাধর শিরোমণি। তিনি লক্ষ্য করিলেন শ্রোতা সাধারণ রামায়ণের কথকতায় যত না আকৃষ্ট হয়, রামায়ণগানে আকৃষ্ট হয় ততোধিক, এই চিন্তাধারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ভাগবতে প্রথম সুরযোজনা করিয়া "কথকতা" আরম্ভ করেন এবং "কথকতা" এক নূতন রূপ লইয়া তখন আবির্ভূত হইল। শিরোমণি মহাশয় বিশেষ সুকণ্ঠ ও সুবক্তা ছিলেন। "কথকতার" এই নূতন রূপ সারা বাংলাদেশে এক অভূতপুর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে অধিকতর আকৃষ্ট করিল। শিরোমণি মহাশয় ক্রমে ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি 'ভাগবতের' উৎকৃষ্ট অংশ সমূহে সুর যোজনা করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন, এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সুর ধর্ম্মী ধারাটিই ক্রমে আরো সমৃদ্ধ হইয়া বাংলাদেশে স্থায়ী হয়। "কথকতায়" যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীধর কথক, রামধন শিরোমণি, কৃষ্ণধন শিরোমণি, ধরণী শিরোমণি প্রভৃতি।

যাত্রাগান

"রামায়ণ" শব্দটি "রাম + অয়ন" এই দুইটি শব্দযোগে নিষ্পন্ন। "অয়ন" শব্দের অর্থে 'যাত্রা" বোঝায়। সুতরাং রামায়ণ কথাটির অর্থ রামযাত্রা অর্থাৎ রামচরিত্র গাথা বা গান। রামযাত্রা হইতেই নাকি যাত্রাগানের সৃষ্টির সুচনা হয়।

মহর্ষি "বাল্মীকি" রামায়ণ রচনা করেন। পুরাণে উল্লেখ আছে যে লব ও কুশ দ্বারা রামায়ণ গান গীত হইত। রামায়ণের সমগ্র

অংশই তখন সুললিত সুরে গীত হইয়া রাম মহিমা প্রচার করিত। পরবর্তী পৌরাণিক কাহিনী ও রামায়ণেরই অনুকরণে গীত হইয়া প্রচারিত হইত। প্রাচীন কালে যাত্রাগানের মৌলিক আকার সংগীতেই নিবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ইহাতে বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয়, বক্তৃতা ও আরো অন্যান্য আঙ্গিক যুক্ত হইয়া এই যাত্রাগান অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হয় এবং এই বাংলাতেই তার পুষ্টি হয় সর্বাধিক।

প্রাচীনকালে "মঙ্গলগীতি" দ্বারা যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইত। মঙ্গলগীতি লুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সেই স্থানে "নটরাজ" বা "বীনাপাণি" বন্দনা গীতি গাহিয়া "যাত্রাভিনয়" আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত হয় এবং অদ্যাবধিও ইহা অব্যাহত রহিয়াছে। অপ্সরী বেশে নৃত্যের সহিত এই গানের অনুষ্ঠান করানো হয় এবং বারো তেরো বৎসরের ছেলেরাই ইহাতে অভিনয় করিয়া দর্শকদের যাত্রাভিনয়ের প্রারম্ভেই আকৃষ্ট করিয়া তোলে।

প্রাচীন কালের "যাত্রাগানের" মৌলিক আকার বাংলাদেশেই বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে কোন কোন স্থানে অদ্যাবধি প্রাচীন রীতিতেই রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি হইয়া থাকে। 'রামযাত্রাতে" দুইটি বালক লব কুশের বেশে সজ্জিত হইয়া যাত্রাভিনয়ের সমস্ত বিষয়ই গানে পরিবেশন করে ও দলের অন্যান্যরা ঐ গানের পুনরাবৃত্তি করে। তেমনি "কৃষ্ণযাত্রায়" শ্রীদাম ও সুবল সাজিয়া বালক দুইটি গাহিয়া যায় ও অন্যান্যরা পুনরাবৃত্তি করে।

ভগবানের অবতার এবং মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার লীলাকীর্ত্তন করিয়া জনসাধারণের অন্তরে ধর্মভাব জাগ্রত করাই ছিল যাত্রাগানের মূল উদ্দেশ্য। পুরাকালে বসন্তে দোলযাত্রা, শরতে রাসযাত্রা, ও বর্ষায় রথযাত্রা প্রসিদ্ধ ছিল এবং এই তিন ঋতুতেই যাত্রাগান হইত। ক্রমে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, শিব লীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক

উপাখ্যান লইয়া "যাত্রা" এত অধিক পুষ্ট হইল যে কেবল মাত্র তিন ঋতুতে তাহা সীমাবদ্ধ রহিল না। সকল সময়ে ও সকল ঋতুতেই যাত্রা অনুষ্ঠান চলিতে আরম্ভ করিল। যাত্রাগানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

বাংলাদেশের যাত্রাগায়কদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন পরমানন্দ অধিকারী ও তদীয় শিষ্য বদন ও গোবিন্দ অধিকারী।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপাল উড়ে, মদনমাষ্টার, বৈকুণ্ঠ, লোকা ধোপা, ব্রজরায়, মতিরায়, নীলকণ্ঠ, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতিও বাংলার বিখ্যাত যাত্রাগায়ক ছিলেন।

———

রবীন্দ্রসঙ্গীত

॥ রবীন্দ্রনাথের শৈশবে সংগীত-শিক্ষা ও প্রেরণা ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বিশুদ্ধ সংগীতের আবহাওয়ায়। তৎকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বহু গুণী সংগীতজ্ঞের সমাবেশ হইত। বড়দের লইয়া সেই আসর জমিয়া উঠিত। ছোটরা সেই আসরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইত না। শিশু রবীন্দ্রনাথের সুদূর-পিয়াসী মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত সংগীতের জন্য। বদ্ধ দরজার ভিতর হইতে ভাসিয়া আসিত বিচিত্র রাগ-রাগিণীর সুর-লহরী। অন্তরাল হইতে তিনি শুনিতেন সেকালের শ্রেষ্ঠ গুণীদের গান। এইভাবেই রাগ-রাগিণীর সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল। বড় বড় ওস্তাদের গান এবং হিন্দুস্থানী মার্গ-সংগীতের প্রভাব তাঁহার চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। তিনি

বলিয়াছেন, "ছেলেবেলায় যে সব গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকে ভাল হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ব ও মাধুর্য্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথ শৈশবে সংগীতে অনুপ্রেরণা কিভাবে এবং কোথা হইতে পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সংগীত শিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু। ধ্রুপদ ও খেয়ালে সিদ্ধ এই সংগীতগুণীর নিকট রবীন্দ্রনাথ শৈশবে সংগীত চর্চা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ব্যতীত শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষকদের মধ্যে যদুভট্ট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যদুভট্ট অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত। যদুভট্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙ্গালী গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মত তাল ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি Originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"

যদুভট্টের বিখ্যাত গান "আজু বহত বসন্ত পবন" গানটির অনুকরণে পরবর্ত্তীকালে তিনি রচনা করিয়াছিলেন "আজি বহিছে বসন্ত পবন" গানখানি।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে সংগীতে প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোতে নিত্যনূতন সুর বাজাইতেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই সুরগুলিকে কথা দিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। গীত-রচনা শিক্ষা এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে রাগ-রাগিণীর সহিত নিবিড় পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া গীতরচনার ক্ষেত্রে তিনি রাগ-রাগিণী কদাচ অবহেলা করিতে পারেন নাই। সুরযোজনার ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীই ছিল তাঁহার একমাত্র সহায়। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন ভারতীয় সংগীতের বোদ্ধা ব্যক্তি। তিনি তাঁহার সন্তানদের সংগীতে অনুপ্রেরিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সাংগীতিক আবহাওয়া, পরিবেশ, বিশুদ্ধ রাগ-সংগীত শ্রবণ ও শিক্ষা, প্রখ্যাত সংগীতগুণী ও সংগীত-রসিকদের সাহায্য ও প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালে সার্থক সংগীত-রচয়িতা হইতে সাহায্য করিয়াছে।

॥ রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী ॥

গায়কী বলিতে সুস্পষ্টভাবে কি বুঝায় সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। গাহিবার পদ্ধতিকেই কি গায়কী বলিব? তাহাই যদি হয় তাহা হইলে উত্তম সংগীত পরিবেশনকে (Demonstration) গায়কী বলিতে হয়। অথবা কেহ যদি স্বরলিপি দেখিয়া কোন একটি গান স্বরলিপি অনুযায়ী গাহিতে পারেন তাহা হইলে তাহাকে কি গায়কী বলিব?

ধ্রুবপদ প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্গীতের পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য এবং গায়কী আছে। বৈশিষ্ট্য ও গায়কী এই দুইটি বস্তু পরস্পর খুব নিকট আত্মীয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহার পূর্ণ জ্ঞান আছে গায়কী তাঁহার কণ্ঠে সহজেই আসিবে। কথা ও সুরের মিলন জনিত সৌন্দর্য্যই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অতএব কাব্য-রস-বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং কাব্যের মুল সুরটি কি তাহাও জানিতে হইবে। গীতালি, গীতাঞ্জলি, খেয়া ও মহুয়া কাব্যের মুল সুরটি না জানা থাকিলে উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থের গানগুলির রস উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। অন্যদিকে সুর, মীড়, মুর্চ্ছনা ও শ্রুতি বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কাব্যসঙ্গীতে ভাবের সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা, তার ক্রমবিকাশ, সুরবৈচিত্র্য, কাব্যবোধ, রাগ-রাগিণীর রূপ এবং বিভিন্ন তাল ও ছন্দের জ্ঞান, এতগুলি বিষয়কে জানিতে হইবে, তাহা হইলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কী সহজেই কণ্ঠে আসিবে। ইহার জন্য প্রয়োজন সাধনা। ইহা অনায়াসলভ্য নহে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়কী একই প্রকার। বিভিন্ন শিল্পী ভিন্ন ভিন্ন গায়কী দিয়া গান গাহিতে পারেন না। সে স্বাধীনতা তাঁহাদের নাই।

স্বরলিপি গানের কাঠামো, গায়কী তাহাতে করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। কেবলমাত্র স্বরলিপি দেখিয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিচার করিলে ভুল হইবে।

॥ রবীন্দ্রনাথের হিন্দী, আন্তঃপ্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত ভাঙ্গা কয়েকটী গান ॥

কবি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। সুতরাং যেখানে যাহা কিছু সুন্দর তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হিন্দী ভাঙ্গা বহু গান আছে। কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল।

হিন্দী ভাঙ্গা গান :—

মূল গান—	রবীন্দ্রনাথের গান—
বহুর বজাও বংশী	আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা
আজু বহত বসন্ত পবন	আজি বহিছে বসন্ত পবন
জিন ছুঁয়ো মোরে	আঁখিজল মুছাইলে
ইয় জগ ঝুট	আমারে করো জীবন দান
এরিমা সব বন অমুয়া	ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে

প্রাদেশিক সংগীতের সুরের গান :—

মূল গান -	প্রদেশ—	রবীন্দ্রনাথের গান—
নাদ বিন্দ্যা পরব্রহ্ম	মারাঠি	বিশ্ববীণা রবে
নিতু চরণ মূলে	মাদ্রাজী	বাজে করুণ সুরে
এ হরি সুন্দর	পাঞ্জাবী	এ হরি সুন্দর
বৃন্দাবন লোলা	দক্ষিণী	নীলাঞ্জন ছায়া
সখী বা বা	কানাড়ী	বড় আশা করে

পাশ্চাত্য সংগীতের সুরের গান :—

মূল গান—	রবীন্দ্রনাথের গান-
Nancy Lee	কালী কালী বল্‌রে আজ
Robin Adair	সকলি ফুরালো
Drink to me only	কতবার ভেবেছিনু
Go where glory waits thee	ওহে দয়াময়

তাল ও ছন্দ

রবীন্দ্র-সংগীতে প্রাচীন ও প্রচলিত বহু প্রকার তালের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম জীবনের গানগুলি অধিকাংশই হিন্দুস্থানী মার্গ-সংগীতের অনুকরণে রচিত। সেই জন্যই হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রচলিত তালগুলি অতি সহজেই রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

ধামার, চৌতাল, সুরফাঁকতাল, আড়াচৌতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, তেওড়া, ত্রিতাল, মধ্যমান, খৎ, কাহারবা ও দাদ্‌রা তালগুলি বহুলভাবে রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছয়টি তালের সৃষ্টি করেন :— যথা :—

১। ঝম্পক = ৫ মাত্রা

ঠেকা—ধি ধি না | ধি না
× | ২

গান—যেতে যেতে একলা পথে—

২। ষষ্ঠী = ৬ মাত্রা

ঠেকা— ধা গে | ধা গে তে টে
× | ২

গান—শ্যামল ছায়া নাই বা গেলে····

৩। রূপকড়া = ৮ মাত্রা

ঠেকা—ধি ধি না | ধি না | তি তি না
× | ২ | ৩

গান—গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে···

৪। নবতাল = ৯ মাত্রা

ঠেকা—ধা দেন্ তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে
× | ২ | ৩ | ৪

গান—নিবিড় ঘন আঁধারে····

৫। একাদশী = ১১ মাত্রা

ঠেকা—ধা দেন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে
× | ২ | ৩

ধাগে তেটে তাগে তেটে
৪

গান — দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া....

৬। নবপঞ্চতাল = ১৮ মাত্রা

ধা গ ধা গে | দে ন্তা | তে টে | ধা গে | দে ন্তা
× | ৪

গদি ঘেনে | ধাগে তেটে | তাগে তেটে
০ | ৫ | ০

গান—জননী তোমার করুণ চরণখানি....

———

"সংগীতের মুক্তি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলবে...."। অন্যত্র আবার বলিয়াছেন, "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়"।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দোগুরু। সেইজন্য তাঁহার সংগীতেও অপূর্ব ছন্দবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কথা ও সুরের মিলন রবীন্দ্র-সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার কথা ও সুরের সহিত তাল ও ছন্দের মিলনও রবীন্দ্র-সংগীতের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংগীত কাব্যের ভাব প্রকাশে সহায়তা করে। এই ভাবেই তালেরও প্রয়োগ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বড় কবিতাগুলিতে সুর-সংযোজনা ও ছন্দ লক্ষ্য করার বিষয়। এই প্রকার গানে monotony কাটাইবার জন্য তিনি বিভিন্ন স্তবকে কাব্যের ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার তালের প্রয়োগ করিয়াছেন। "হে নিরুপমা", "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে", "বিশ্ববীণা রবে" "নৃত্যের তালে তালে" গানগুলি ছন্দ-বৈচিত্র্যের অপূর্ব নিদর্শন। "কৃষ্ণকলি" গানটি তালবদ্ধ নহে, কথা বলিবার ছন্দে এই গানটি গীত হইয়া থাকে। গভীর রসবোধ ও ছন্দবোধ না থাকিলে গানটি গাওয়া অতিশয় কঠিন। গীতি-নাট্যে ও নৃত্য-নাট্যে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রগত ভাব অনুযায়ী গানে তালের প্রয়োগ আছে। "শ্যামা" নৃত্যনাট্যে কোটালের গানগুলি লক্ষ্য করিলে উদ্ধত ও কঠোর ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন কোটাল শ্যামাকে বলিতেছে—"চুপ কর! দূরে যাও নারী; বাধা দিও না, বাধা দিও না"। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ছন্দ বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। রবীন্দ্র সংগীতে আমরা গানের ভাব ও মেজাজ অনুযায়ী তাল ও ছন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে" গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত গানটি দুই প্রকার ছন্দে গীত হইয়া থাকে। একটি কাহারবা এবং অন্যটি ষষ্ঠী। কাহারবা তালের প্রয়োগে গানটির

মধ্যে উচ্ছলভাই প্রকাশ পায় এবং ষষ্ঠী তালে ঐ একই গানের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যে গান উচ্ছলতা প্রকাশ করিল কাহারবা তালে, সেই গানেই আবার উদাস ভাব আনিয়া দিল ষষ্ঠী তাল। মূল কথা হইল রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংগীতে গানের অন্তর্নিহিত ভাবটি যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাল ও ছন্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্র সংগীতে ধ্রুপদ ও টপ্পা-গানের প্রভাব

হিন্দু-সংগীতে মূলত যে পাঁচটি ভাগ আছে রবীন্দ্রনাথও সেই পাঁচটি ভাগে বহুসংখ্যক গান রচনা করিয়াছেন। সেই পাঁচটি ভাগ হইল ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুগে ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা ইত্যাদির অনুকরণে শাস্ত্রসম্মতভাবে বহুগান রচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন ধ্রুপদ, ধামার ও টপ্পার প্রচলনই ছিল অধিক। খেয়াল ও ঠুংরী এত উৎকর্ষ লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সংগীত রচনায় ধ্রুপদ ও টপ্পার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সংগীত, কাব্য-সংগীতেও ধ্রুপদ ও টপ্পার অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্য হইল সুরের স্থিতি ও সংযম। রবীন্দ্র-সংগীতেও এই বৈশিষ্ট্যটুকু বিদ্যমান। মীড়, গমক, ছোট টপ্পার দানা রবীন্দ্র-সংগীতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। হিন্দুস্থানী টপ্পার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন যথা:— "এ পরবাসে রবে কে", "এ কি করুণাময়" ইত্যাদি। আবার "সার্থক জনম আমার", "কোথা যে উধাও হলো" ইত্যাদি গান-গুলিতেও টপ্পার অলঙ্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে কীর্ত্তনাঙ্গ গানেও টপ্পার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই", "তোমায় নতুন ক'রেই পাব বলে"

ইত্যাদি। ধ্রুপদের মীড়, গমক এবং টপ্পার অলঙ্করণ সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-সংগীতের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। উপরোক্ত গানগুলি কেবল স্বরলিপির সাহায্যেই গাওয়া যায় না। ইহার গায়কী বিশেষজ্ঞের নিকট শুনিয়া শিখিতে হয়।

॥ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি হিন্দী ভাঙা ধ্রুপদ ও টপ্পা ॥

ধ্রুপদ—

মূল গান—	রাগ ও তাল—		রবীন্দ্র সংগীত—
আজু বহ সুগন্ধ পবন	পূর্বী,	তেওড়া	আজি বহিছে বসন্ত পবন
জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনসারং,	,,	জয় তব বিচিত্র আনন্দ
জগজন ধ্যান করত	বড়হংসসারং,	চৌতাল	তাঁহারে আরতি করে
বেণী নিরখত ভুজঙ্গ	আড়ানা	,,	বাণী তব ধায়
আয়ো ফাগুন বড়োমান	নায়কীকানাড়া,	ধামার	সুধাসাগরতীরে (ধামার)

টপ্পা

মূল গান—	রাগ ও তাল—		রবীন্দ্র-সংগীত—
ও মিঞা বেজনুওয়ালে	সিন্ধু	মধ্যমান	এ পরবাসে রবে কে
বে পরিয়া তাঁড়ে	,,	,,	কে বসিলে আজি
মিঞা বে মানুড়ে	ঝিঁঝিট	,,	হৃদয় বাসনা পূর্ণ হোল

———

বিষয়বৈচিত্র্য

রবীন্দ্র-সংগীতে বিষয়বৈচিত্র্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ বৈচিত্র্য সম্ভার পূর্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন কবির নিকট হইতে আমরা পাই নাই। কেহ হয়ত হাসির গান রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, কেহ প্রেমের গান লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু একাধারে বিভিন্ন বিষয়ে সংগীত রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথই সফল হইয়াছেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। মানবমনের বিভিন্ন অনুভূতির গান আমরা তাঁহার রচনার মধ্যে পাই। ইহা ছাড়া স্বদেশী গান, ধর্ম-সংগীত, আনুষ্ঠানিক গান, ঋতু-সংগীত ও হাসির গান ইত্যাদি তাঁহার গীতরচনাকে সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে শোকে, দুঃখে, আনন্দে ও উৎসবে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিত্যসংগী। রবীন্দ্রনাথ প্রায় আড়াই হাজার গান লিখিয়াছেন। তাঁহার এই বিপুল সংগীত রচনার মধ্যে আমরা আমাদের প্রয়োজন মত গান বাছিয়া লইতে পারি। তিনি গাহিয়াছেন বিশ্ব-প্রকৃতির গান, বিশ্ব-পতির গান ও বিশ্ব-মানবের গান। তাঁহার রচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল যে তাঁহার সংগীতের ভাবধারায় কোন বিশেষ ধর্মের বা বিশেষ সম্প্রদায়ের স্থান নাই। সেইজন্য সকল মানুষের মধ্যেই তাঁহার গান স্থান লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-সংগীতের পাঁচটি পর্য্যায় ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার রচিত সংগীতকে 'পূজা' 'প্রেম' 'প্রকৃতি' প্রভৃতি বহু বিষয়বিন্যাসে ভাগ করিয়াছেন। গানের দৃষ্টান্ত সহ বিভাগটি এইরূপ—

পূজা—

গান····	····	কান্নাহাসির-দোল-দোলানো—
বন্ধু ····	····	তোমায় আমায় মিলন হবে বলে·
প্রার্থনা ···	····	আমার মিলন লাগি তুমি—
বিরহ····	····	পথ চেয়ে যে কেটে গেল—

প্রকৃতি—

———

রবীন্দ্র সংগীতে মিশ্রণ

প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতীয় সংগীতে বহু নূতন রাগ-রাগিনী সৃষ্টি হইয়াছে। এক রাগের সহিত অন্য একটি রাগের মিশ্রণ বা এক রাগের সহিত দুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণে নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে। এই ভাবে ভারতীয় সংগীতে নূতন রাগ-রাগিনী সৃষ্টি হইাছে মিশ্রণের সাহায্যে। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়াই নূতন সৃষ্টি হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রাগ-রাগিনীকে ভাঙ্গিয়া, মিশ্রণের সাহায্যে বাংলা গানের নূতন জীবন দিলেন।

"সংগীতের উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়-জয়ন্তী বাঁচুন অথবা মরুন আমি পঞ্চমকেই বহাল রাখিব না কেন?" ভাব প্রকাশে সহায়তা করে এবং কাব্যের সৌন্দর্য্য ও রস ফুটিয়া উঠে এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজন মত রাগ-রাগিনীর সাহায্য লইতেন। "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু" গানটির কথা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। মিশ্রণের অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় এই গানটিকে বিশ্লেষণ করিলে। ইহাতে ললিত, বিভাস, রামকেলী ও আশাবরী সহজ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। গানটির ভাব অনুযায়ী যেখানে যেমনটির প্রয়োজন ঠিক তেমনটি সেই খানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মিশ্রণ কিন্তু পৃথকভাবে ধরিবার উপায় নাই। গানটি শুনিবার সময় সমগ্র ব্যঞ্জনাটুকু উপলব্ধি করা যায়, এই খানেই মিশ্রণের বাহাদুরী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মিশ্রণের রাজা। বাল্যকালে দরবারী সংগীতের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিলেন বলিয়াই যে তিনি মিশ্রণে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে। ভারতীয় রাগ-রাগিনীর সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং রাগ-রাগিনীগুলিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অপূর্ব মিশ্রণের দ্বারা রবীন্দ্র-সংগীতে রস-বোধ গভীর হইয়াছে এবং সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

মিশ্রণের দিক্ হইতে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে এমন কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল।

১। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু।

২। প্রখর তপন তাপে।

৩। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।

৪। চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।

রবীন্দ্র-সংগীত সংখ্যায় বিপুল এবং ইহা তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম যুগের গান, মধ্যযুগের গান এবং শেষযুগের গান। রবীন্দ্র-সংগীতে এই তিনটি যুগই হইল তিনটি স্তর। "রবীন্দ্র-সংগীতে মিশ্রণ" একটি পৃথক স্তর বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং এই স্তরেও বিপুল সংখ্যক গান আছে। সবগুলির পরিচয় ও দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগী ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা যদি রাগ-সঙ্গীতে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া ও রবীন্দ্র-কাব্যে প্রবিষ্ট হইয়া গবেষণা করেন তাহা হইলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মিশ্রণ কতদূর সার্থক হইয়াছে এবং মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের যে কি অসীম ক্ষমতা ছিল সেই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

———

রবীন্দ্র-সংগীতে লোক-সংগীতের প্রভাব

সুর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হিন্দুস্থানী রাগসংগীতকে কেন্দ্র করিয়াই সংগীত রচনা করেন নাই। বাংলার লোক-সংগীতকে তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সংগীতে লোক-সংগীতের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। গ্রামে জমিদারীর কাজ তত্ত্বাবধান করিবার সময় কবি গ্রামের বাউলদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সেই গ্রামাঞ্চলের গান তাঁহার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাহাদের সহজ সরল ভাষা ও সুরে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ ক'রেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হোত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলদের সুর গ্রহণ ক'রেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।"

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কি গভীরভাবেই বাউলদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের সুরে তিনি কতকগুলি গান রচনা করেন। যথা :—

	মূল গান—	রবীন্দ্রনাথের গান—
১।	হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে	—"যদি তোর ডাক শুনে"
২।	মন মাঝি সামাল	—"এবার তোর মরা গাঙ্গে"
৩।	আমি কোথায় পাব তারে	—"আমার সোনার বাংলা"

ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রবীন্দ্র-সংগীতের বিভিন্ন পর্য্যায়েই বাউল গানের সুর আছে। কেবলমাত্র ধর্মমূলক বা অধ্যাত্ম-বিষয়ক গানে নহে। প্রেমবৈচিত্র্য, ঋতুবিষয়ক-সংগীত, স্বদেশী-সংগীত ইত্যাদিতেও বাউল সুর আছে। রাগ-রাগিণীর সহিত অতি সহজ ও সুন্দর ভাবে বাউল সুরের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাহাতেই রবীন্দ্র-বাউল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছে। বাংলার বাউলদের সুর গ্রহণ করিয়াও সেই সুর আপন স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-বাউলের বৈশিষ্ট্য হইল অনবদ্য ভাষা, বাউল সুরের সহিত রাগ রাগিণীর মিশ্রণে সুরের বৈচিত্র্য এবং বিষয়-বৈচিত্র্য। বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এমন বাউল গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য-রচনা, তেমনি ভক্তিরস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে।"

রবীন্দ্রনাথ দেশী-সংগীতকে গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাউল, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, সারি গান ইত্যাদির অনুকরণে রচিত গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নিপুণ সুর মিশ্রণে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত-রচনার মধ্যে বাউল, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, সারি, ভাটীয়ালী ইত্যাদি দেশী-সংগীতের অন্তর্গত সুরগুলি এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

———

রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার্থীর কণ্ঠ সাধনা ও রাগ জ্ঞান

যে কোন প্রকার সংগীতকে আয়ত্ত করিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে।

রবীন্দ্র সংগীতের বৈশিষ্ট্য ও গাহিবার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে হইলে মার্জিত কণ্ঠস্বর, টপ্পা অংগের অলংকরণ, মীড়, স্বর-জ্ঞান এবং শ্রুতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

রবীন্দ্র-সংগীতে পারদর্শী হইতে হইলে স্বর-ক্ষেপণে লঘুত্ব ও গুরুত্ব, সংযত কণ্ঠস্বর, মীড়ের প্রয়োগ, সাবলীল উচ্চারণ-ভঙ্গী অতি সুনিপুণভাবে চর্চা করা প্রয়োজন।

মার্গ-সংগীতের ন্যায় রবীন্দ্র সংগীতের গায়ন-পদ্ধতিও অনুশীলন সাপেক্ষ। মার্গ-সংগীতের ধারাকে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্র সংগীত অনুশীলন করিতে হইবে। গানের দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করিলেও এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে। কবিগুরুর একটি গানের উল্লেখ করিতেছি, "আমি তোমার সংগে বেঁধেছি আমার প্রাণ" এই গানটিকে যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে এই গানের রাগের রূপ এবং একাধিক রাগের মিশ্রণ কিভাবে ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। ইমন, পূরবী, ভৈরবী, কানাড়া, খাম্বাজ, কাফী, ভৈঁরো, তোড়ী, বসন্ত বাহার, মল্লার ও বাগেশ্রী রাগে অসংখ্য গান রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যে আছে। তাহা ছাড়া মধ্য বয়স হইতে শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি যে সব গান রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে দুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণ করিয়াছেন। সেই মিশ্রণ গানের ভাব প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে এবং রবীন্দ্র-সংগীতের অপূর্ব সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছে। মিশ্রণের দিক্ হইতে "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু" গানটি অনবদ্য সৃষ্টি। আশাবরী, রামকেলী, ললিত ও বিভাস এই চারটি রাগের সমন্বয় ঘটিয়াছে এই গানটিতে। গানটি গাহিবার কালে কিন্তু কোন রাগের কথা মনে স্থান পায়না।

ইহার একমাত্র কারণ অপূর্ব মিশ্রণ-দক্ষতা। ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রে সা, রে, গ, ম ইত্যাদি সাতটি স্বরকে কোন না কোন ভাবের সূচক বলা হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-সংগীতকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে কি ভাবে স্বরের রূপগুলি এই সংগীতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের গোড়াপত্তন হইয়াছিল বিশুদ্ধ মার্গ-সংগীতে। পরিবারের সাংগীতিক পরিবেশ, সেকালের গুণীদের সংগীত শ্রবণ ও তাঁহাদের নিকট সংগীত শিক্ষা তাঁহার জীবনে সার্থক হইয়াছিল। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, রাগ-রাগিণীর মূল রসটি, তাহাদের রূপ ও প্রকৃতি।

"দীপ নিবে গেছে মম" কবিগুরুর একটি বিখ্যাত গান। বেহাগ রাগে ও ঝাঁপতালে গানটি রচিত। গানটি গাহিবার কালে লক্ষণীয় বিষয় এই যে বারবার সুরটি ন্যাস করিতেছে গান্ধারে। বেহাগের বাদী গান্ধার এবং সম্বাদী নিষাদ। কবিগুরু এই গানটিতে বেহাগের বাদী ও সম্বাদীকে ঠিক মর্যাদা দিয়াছেন। কোমল নিষাদ বেহাগে বর্জিত স্বর বলিয়া ইহার প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত নহে। কিন্তু শাস্ত্রে ইহাও আছে যে বর্জিত স্বরকে বিবাদী স্বররূপে যদি নিপুণভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। উপরিউক্ত গানটির একস্থানে আছে, "ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে" এই খানে ক্লান্তি ও অবসন্নতা এই ভাবটিকে প্রকাশ করিবার জন্য কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই খানেই রবীন্দ্রনাথ সার্থক রূপকার। রাগের মেজাজ (Sentiment) তাহার চলন ও গতি সম্বন্ধে যদি বিশেষ জ্ঞান থাকে তাহা হইলে রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়া অতি সুন্দর হইয়া উঠিবে। আর একটি গানের দৃষ্টান্ত দিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। "বুঝি বেলা বহে যায়" গানটি ভীমপলশ্রী রাগকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। গানের প্রথম অংশে ভীমপলশ্রীর রূপটি পরিষ্কার কিন্তু অন্তরায়

শেষে "কই সে হোল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়" এই পংক্তিটিতে হঠাৎ কোমল ধৈবতের প্রয়োগ সার্থক হইয়াছে। আমরা এ কথা জানি যে ভীমপলশ্রীতে কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয় না কিন্তু এমনই প্রয়োগ নৈপুণ্য যে ইহার ব্যবহারে গানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে আসিল না, সেই মালা গাঁথা ব্যর্থ হইল এই বিফলতার ভাবটি সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোমল ধৈবতের ব্যবহার সহ "কোথা যে উধাও হোল" গানটি মিঞামল্লার রাগের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। মিঞামল্লারের প্রকৃতি জানা না থাকিলে উপরি-উক্ত গানটি মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া গাওয়া যায় না। এই জন্যই রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে রাগ-সংগীত বিশেষ-ভাবে আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

ভানুসিংহের পদাবলী

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "ভানুসিংহ" ছদ্মনামে ভানুসিংহের পদাবলী (মোট ২২টি কবিতা) লিখিয়াছিলেন এবং সেগুলি তদানীন্তন ভারতী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অক্ষয় চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র কর্ত্তৃক সংকলিত কাব্যসংগ্রহ বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতেন। প্রাচীন পদকর্ত্তাদের বিষয়ে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ ছিল। ভানুসিংহের পদাবলী মৈথেলী-মিশ্রিত ভাষার অনুকরণে রচিত। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ীর ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'।"

এইটাই হইল ভানুসিংহের পদাবলীর প্রথম রচনা। ইহার রচনা কাল ১২৮৪ সাল। ভানুসিংহের পদাবলীর মোট কবিতার সংখ্যা ২২টা। সব কয়টী কবিতায় সুর সংযোজিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

নিম্নলিখিত রচনাগুলির সুর স্বরবিতানের ২১ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১। গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
২। শুনলো শুনলো বালিকা
৩। সজনি সজনি রাধিকা লো
৪। মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান
৫। বাজাওরে মোহন বাঁশী
৬। শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
৭। আজু সখি মুহু মুহু
৮। হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে
৯। সতিমির রজনী, সচকিত সজনী,

উপরোক্ত গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে এবং গ্রামোফোন রেকর্ডেও গানগুলি অধিকাংশই বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ড করা হইয়াছে।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'আমার বন্ধুটীকে একদিন বলিলাম, 'সমাজের লাইব্রেরী খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটী জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোন প্রাচীন কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি।' এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।' তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা।

বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, 'নিতান্ত মন্দ হয় নাই।' তিনি আরো লিখিয়াছেন—ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় তখন জার্মানীতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতি-কাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি বই লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্ত্তা রূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

পরিবেশ

পরিবেশ সৃষ্টি করাই ভারতীয় সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য। যে সংগীত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না তাহার স্থায়িত্ব নাই। যে কোন সংগীতের ক্ষেত্রেই এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরিবেশ সৃষ্টি করাই ভারতীয় সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে কারণ যে যে বিশেষ গুণ থাকিলে সংগীত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে রবীন্দ্র সংগীতে সেই বিশেষ গুণগুলি আছে।

১। কাব্য সম্পদ
২। সাহিত্যিক মূল্য
৩। ভাষার ঐশ্বর্য্য
৪। বিষয় বৈচিত্র্য
৫। সুর বৈচিত্র্য
৬। ছন্দ বৈচিত্র্য
৭। রাগের মিশ্রণ
৮। সার্বজনীনতা
৯। দর্শন
১০। কথা ও সুরের অপূর্ব মিলন

রবীন্দ্র সংগীতে এতগুলি গুণের সমাবেশ হইয়াছে বলিয়াই এই সংগীত যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছে এবং চলিবে। আজ হইতে

৫০।৬০ বৎসর পূর্বের রচিত গানও নতুন যুগের মানুষের নিকট সমান আকর্ষণীয়। উদাহরণ স্বরূপ ২।:টী গানের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। 'এস আমার ঘরে এস' গানটি আজ হইতে প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু গানটি আজও শিশু, যুবা বৃদ্ধ সকলের কাছেই অতি প্রিয়। 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটি আজও জনপ্রিয়। অসংখ্য গান আছে যাহা শুনিলে মনে হয় যেন ইহা আজকালের রচনা। পুরাতনের কোন গ্লানি ইহার মধ্যে নাই। রবীন্দ্রনাথের সব সৃষ্টিই চিরনূতন। বিষয় বৈচিত্র্যে রবীন্দ্র সংগীত অতুলনীয় একথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সংগীত রচনা হইতে আমরা আমাদের প্রয়োজন মত গান অনায়াসে নির্বাচন করিতে পারি। মানব মনের সর্ব অনুভূতির গান আমরা রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে পাই। পূজায়-প্রার্থনায়, শোকে-দুঃখে, বিরহ-মিলনে, ব্যথা ও বেদনায়, হাসি-কান্নায়, সর্বঋতুতে আমরা রবীন্দ্রনাথের গান দিয়া উৎসব অনুষ্ঠান করিতে পারি। অনুষ্ঠান অনুযায়ী গান নির্বাচন করিবার সুবিধা আছে বলিয়াই রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে।

সুরের অসাধারণ বৈচিত্র্য আছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের সকল শ্রেণীর সংগীতের কাছে ঋণী হইয়াও রবীন্দ্রনাথের গান আপন স্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ। ইন্দিরাদেবীর ভাষায় বলিতে হয়—"রবীন্দ্র-সংগীত দেশী-বিলাতী, একাল-সেকাল ও জটিল সরলের সমন্বয়। বাংলার কীর্তন বাউল রামপ্রসাদী কোন কিছুকেই তিনি অবহেলা করেন নাই। এই সব সংগীতের গভীরতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিজের গানে তাহা কাজে লাগাইয়াছেন। পাশ্চাত্য সংগীতের সুরও রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাল ও ছন্দ :—এক দিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন হিন্দুস্থানী সংগীতে

প্রচলিত ও ব্যবহৃত সমস্ত তালের ব্যবহার

করিয়াছেন নিজের গানে অন্যদিকে আবার তাঁহার নিজস্ব সৃষ্ট ছয়টি নতুন ছন্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সংগীতে ব্যবহৃত প্রাচীন ও প্রচলিত তাল :—ধামার, চৌতাল, আড়া চৌতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, ত্রিতাল, যৎ, মধ্যমান আড়াঠেকা, তেওরা।

নতুন ছন্দ বা তাল :—ষষ্ঠী, একাদশী ঝম্পক, নবতাল, নবপঞ্চ তাল ও রূপকড়া তাল।

ইহা ছাড়া কাহারবা, দাদ্‌রা, খেমটা, ইত্যাদি সহজ এবং অতিপ্রচলিত তালগুলিও প্রয়োগনৈপুণ্যে তাঁহার গানে অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে।

রাগ-রাগিনীর একটি চিরন্তন আবেদন আছে। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই তাহা অস্বীকার করেন নাই। রাগ-রাগিনীর মূলরস তাহার গানের কথা মিশ্রণেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

কাব্যে সুরে ছন্দে, রাগ রাগিনীর প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয় বৈচিত্র্যে ও ভাবসমৃদ্ধিতে রবীন্দ্র সংগীত এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। তাঁহার গানে universal appeal আছে। যাহাকে আমরা বলি সার্বজনীন আবেদন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহার গান মানুষ গাহিতে পারে।

এতগুলি গুণ আছে বলিয়াই রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া চলিতেছে ও চলিবে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

দত্তিল—চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী

দত্তিল সংগীত বিষয়ে "দত্তিলম্" নামক গ্রন্থের রচয়িতা। চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালের অনেক গ্রন্থকার দত্তিলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দত্তিল স্বয়ংও নিজ গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তীকালের নারদ কোহল ও বিশাখিত প্রভৃতি গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কাল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই। এই কারণে দত্তিলের কাল নির্দিষ্ট করা যায় না। সুতরাং দত্তিলের আবির্ভাব কাল চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। দত্তিলের রচিত "দত্তিলম্" সংগীত সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ, ইহাতে তাল, স্বর ও জাতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রন্থখানি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও তৎকালে সংগীতের রূপ কি প্রকার ছিল উক্ত গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়।

শার্ঙ্গদেব—ত্রয়োদশ শতাব্দী

শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে অদ্যাবধি যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে শার্ঙ্গদেব রচিত "সংগীত রত্নাকর" তৎসমুদয়ের শীর্ষ স্থানে অধিষ্ঠিত। তাঁহার পিতা সোঢল কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি বাসস্থান পরিবর্ত্তন ক্রমে দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। তথায় তিনি দেবগিরি রাজ্যের যাদব রাজার উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। সোঢলের পুত্র আচার্য্য শার্ঙ্গদেবও দেবগিরি রাজ বাদশাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। (১২১০—১২৪৭ খ্রীঃ)।

শার্ঙ্গদেবের প্রসিদ্ধ সংগীত-গ্রন্থ সংগীত রত্নাকরের টীকাকার সিংহ ভূপালের লিখিত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে প্রাক্ শার্ঙ্গদেব যুগের শাস্ত্রীয় সংগীত-গ্রন্থোক্ত দুর্বোধ্য বিষয়গুলি শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সহজবোধ্য করিয়া দিয়াছেন।

যে সকল গ্রন্থকর্তার মতসমূহ মন্থন করিয়া শার্ঙ্গদেব তদীয় সংগীত রত্নাকরে সার সঞ্চয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য সদাশিব, ব্রহ্মা, ভরত, নারদ, তুম্বরু, রাবণ, নন্দিকেশ্বর, মতঙ্গ, কশ্যপ, রাহল, লোলট (ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা) প্রভৃতি এবং আরো অনেক সংগীত গ্রন্থকার।

শার্ঙ্গদেব তদীয় গ্রন্থে নাদ, শ্রুতি, স্বর, মূর্চ্ছনা, জাতি ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব-লিখিত সংগীত-গ্রন্থাদি হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংগীতের মধ্যে এক সমন্বয় আনয়ন করেন। তিনি ৭টি শুদ্ধস্বর, ১২টি বিকৃতস্বর এবং ১৮টি জাতি মানিয়া লন।

স্বর ও জাতি বর্ণনার পর রাগের জাতি হইতে গ্রাম এবং গ্রাম রাগ হইতে অপরাপর রাগের বিকাশ হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের স্বর ও রাগ আধুনিককালের স্বর ও রাগ হইতে পৃথক, কারণ তিনি যে শ্রুতিস্থান নির্দেশ করিয়াছেন তাহা আজ-কালের শ্রুতি হইতে অন্যরূপ। সংগীত-রত্নাকরে বর্ণিত রাগসমূহ বর্ত্তমানকালের উপযোগী নহে। তথাপি সেই গ্রন্থের অপরাপর ভাগে সংগীত সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা আজও আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে আসে। শার্ঙ্গদেবকৃত শুদ্ধ ঠাট 'মুখারী' আধুনিক কর্ণাটী সংগীতে কনকাঙ্গী ঠাট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

———

আমীরখসরু—ত্রয়োদশ শতাব্দী

আমীরখসরুর পিতার নাম আমীর মহম্মদ সৈফুদ্দীন। ইনি পারস্য দেশের খোরাসান প্রদেশের লোক। তিনি স্বদেশ হইতে হিন্দুস্থানে আসার পর এটোয়া জেলার পটিয়ালি গ্রামে ১২৩৪ মতান্তরে ১২১৩ সালে আমীর খসরুর জন্ম হয়। খসরু অতিশয় বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীতে

গিয়াসুদ্দীন বলবন্তের আশ্রয়ে কিছুকাল ছিলেন। এই ভাবে ভারতে থাকাকালীন তিনি পরবর্ত্তী সময়ে আলাউদ্দীন খিলিজীর সভা-গায়ক পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতি-বিদ, দার্শনিক, কবি ও গায়ক। তদুপরি তিনি আলাউদ্দীন খিলিজির ধর্মগুরু এবং প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি ভারতীয় রাগের সহিত পারস্য দেশীয় রাগ মিশ্রণ দ্বারা অনেক নূতন নূতন লোক-রঞ্জন রাগের সৃষ্টি করেন। পিতার শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই আমীরখসরু প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি সর্বপ্রথম খেয়াল গান রচনা করেন—সেই হেতু তাঁহাকে খেয়াল গানের জনক বলা হইয়া থাকে। তিনি অপর এক নূতন ধারার সংগীত সৃষ্টি করেন তাহাকে কাওয়ালী গান বলা হইত। ভারতীয় রাগের সহিত পারস্য দেশীয় রাগের সংমিশ্রণে তিনি ইমন ও হিন্দোল এই দুইটি বিখ্যাত রাগ সৃষ্টি করেন। একাধারে তিনি খেয়াল, কাওয়ালী প্রভৃতি গানের স্রষ্টা এবং সেতারেরও আবিষ্কর্ত্তা। তিনটি তার সংযোগে (সেহ=তিন) তিনি এই যন্ত্রটি তৈয়ার করেন। তিন তারের যন্ত্র বলিয়াই এর নাম সেতার। পরবর্ত্তীকালে বিলাস খান বংশীয় মসীদ খাঁ সেতারের তার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন ও চিকারীর তার যোজনা করিয়া ধ্রুপদ ভাঙ্গা বিলম্বিত গৎ এর প্রচলন ও সেতারের বহুল প্রচার তিনিই করেন। মসীদ খাঁর নামানুসারে সেতারের বিলম্বিত গৎকে মসিদখানি গৎ বলা হইয়া থাকে। সেতারের তানতোড়ার প্রচলনও তিনি করেন। বর্ত্তমান-কালে প্রচলিত সেতার পূর্ব্ব কথিত তিন তারের সেতারেরই উন্নত সংস্করণ। পোস্তা, কাওয়ালী, আড়া চৌতাল, ঝুমরা প্রভৃতি তালও আমীরখসরুরই আবিষ্কার। তিনি ফার্সি ভাষায় "শের" যুক্ত এক প্রকার তারানার সৃষ্টি করেন যাহা এক তালে গাওয়া হইত। তিনি ফার্সি ও আরবী ভাষায় অনেক গীত রচনা করিয়াছিলেন—সে

সমুদয় উত্তর ভারতীয় সংগীতের ঢং-এ গাওয়া হইত। ৭২ বৎসর বয়সে আমীরখসরু দেহত্যাগ করেন।

———

গোপাল নায়ক—ত্রয়োদশ শতাব্দী

আলাউদ্দীন খিলিজীর রাজত্বকালে (১২৬৪ খৃঃ) গোপাল নায়ক দাক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা রামদেব যাদবের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। আলাউদ্দীন খিলিজী কর্তৃক দেবগিরি রাজ্য আক্রান্ত হইলে আমীরখসরু ও দেবগিরি রাজ-দরবারের গায়ক গোপাল নায়কের মধ্যে সংগীত প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় আমীর খসরু ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোপাল নায়ককে পর্যুদস্ত করেন। কিন্তু আমীরখসরু গোপাল নায়কের বিদ্যাবত্তায় এত মুগ্ধ হন যে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে সসম্মানে সভা-গায়ক নিযুক্ত করেন। গোপাল নায়ক সম্বন্ধে অদ্যাপি এই প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে যখনই তিনি দিল্লীর বাহিরে যাইতেন তখনই তাঁহার গাড়ীর বলদের গলায় সময়োপযোগী সংগীত-ধ্বনি-নিঃসারী ঘণ্টা বাঁধিয়া দিতেন।

ঐতিহাসিকদের মতে গোপাল নায়ক ১২৬৪—৬৮ সাল মধ্যে দিল্লীতে আসেন। তৎকালে সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থাদিতে ধ্রুপদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে মনে হয় যে গোপাল নায়ক ধ্রুপদ গাহিতেন না এবং তৎকালে অন্যান্য প্রকার প্রবন্ধ গানেরই প্রচলন ছিল এবং সংস্কৃত তামিল ও তেলেগুই ছিল সে সকল গানের ভাষা। মতান্তরে এরূপ জানিতে পারা যায় যে গোপাল নায়ক সংগীত দিগ্বিজয় করিবার ইচ্ছায় দিল্লীতে আসেন এবং আমীরখসরুর সহিত তাঁহার সংগীত-প্রতিযোগিতা হইলে আলাউদ্দীন খিলিজী

তাঁহার গানে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সভা-গায়ক নিযুক্ত করেন। গোপাল নায়ক অবিসংবাদিতভাবে উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংগীত-গুণী কেহ ছিল বলিয়া জানা যায় না।

কল্লিনাথ লিখিত সংগীত রত্নাকরের টীকা "কলানিধির" তানাধ্যায়ে গোপাল নায়কের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসার উল্লেখ রহিয়াছে। এরূপ জানা যায় যে গোপাল নায়ক নিজ বাটীতে বসিয়া যে সকল রাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেন আমীরখসরু তাঁহার অজ্ঞাতসারে সেই সকল রাগ-রাগিণী শুনিতেন ও আত্মসাৎ করিতেন।

পূর্বী, দেশকার, গৌরী, গুণকেলি, খট্ প্রভৃতি রাগ গোপাল নায়কের সৃষ্টি। গোপাল নায়ক শেষ জীবন দিল্লীতেই অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দ অধিকারী—ত্রয়োদশ শতাব্দী

ইনি বাংলার একজন প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। অনুমান ১২০৫ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সমীপবর্ত্তী জঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর হাওড়া জেলার অন্তর্গত ধুরখালি গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া গোলকদাস অধিকারীর নিকট কীর্ত্তনগান শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল শিক্ষার পর একটি যাত্রার দল গঠন করেন। "কালীয়দমন" পালা অভিনয় উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে তিনি অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ অধিকারী মহাশয় নিজে দূতী সাজিতেন এবং অপূর্ব অভিনয়ের দ্বারা দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার এই দূতীগিরির অভিনয় দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে দর্শকের আগমন

হইত। তাঁহার গভীর ভাবপূর্ণ ও সুসংযত অনুপ্রাস বহুল গীতরচনা সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত। তাঁহার লিখিত ভক্তিরসাশ্রিত গানে শ্রোতৃগণ অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তিনি বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে ভাব উদ্ধার করিয়া সংগীত রচনা করিতেন এবং সেই সঙ্গীত তদীয় সুকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়া অতি সহজেই সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত।

তিনি একাধারে কথকতা যাত্রা এবং কীর্ত্তনে পারদর্শী ছিলেন। যাত্রা গান গাহিয়া তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিত্তশালী হন। তাঁহার যাত্রার দল তৎকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনি "শুক-শারীর পালা" ও 'চুড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব" রচনা করেন। এই দুইটির মধ্যেই বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রভাব বর্ত্তমান। ইনি স্বনামখ্যাত যাত্রাওয়ালা পরমানন্দের দলের একজন "বালক" ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে ইনি পূর্ব্ববঙ্গের জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দলের "বালক" ছিলেন। অবশ্য পরবর্ত্তী সময়ে তিনি যাত্রাওয়ালা হিসাবে প্রভূত যশের অধিকারী হন। অপুত্রক অবস্থায় অনুমান ১২১৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।



বিদ্যাপতি—চতুর্দশ শতাব্দী

তিনি প্রাচীনযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন এবং বাংলাদেশেই তাঁহার অবির্ভাব হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহার জন্মের স্থান ও জন্ম-কাল নিশ্চিন্ত ভাবে অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক এরূপ অনুমিত হয় যে তিনি বাংলাদেশে বিদ্যাশিক্ষা সমাপন করিয়া মিথিলায় যান এবং সেখানে রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। রাজা-বাহাদুর বিহারের অন্তর্গত বিসপী নামক গ্রাম বিদ্যাপতিকে দান করেন। ঐ গ্রামে কবি বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতে-

ছেন। তিনি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু পদাবলী রচনা করেন। তাঁহার লিখিত পদসমূহ ভাবলালিত্য, মনোহারিত্ব ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশে পরিপূর্ণ। চৈতন্যদেব তাঁহার রচিত পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ ও ভাবে বিভোর হইতেন। বিদ্যাপতি বিহারবাসী হওয়ায় তাঁহার রচনাবলীতে বহু হিন্দী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি গয়াপত্তন, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, পুরুষ-শিক্ষা, বিবাদসার, দান-বাক্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাপতি যখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হন তখন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। বিদ্যাপতি ১৪০০ হইতে ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

পণ্ডিত লোচন—চতুর্দ্দশ শতাব্দী

পণ্ডিত লোচনের সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়া কথিত আছে। বিহারের মজঃফরপুর জেলায় তাঁহার জন্মস্থান। তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন, স্বয়ং সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়ায় প্রাচীন ও তৎকালীন সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি যত্নসহকারে সংগীত বিদ্যার প্রভূত চর্চা করেন। তিনি প্রশান্ত মূর্ত্তি, বুদ্ধিমান, নিষ্ঠাচারী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন।

উত্তর ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তিনি রাগ-তরঙ্গিনী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং রাগ-সর্ব্বসংগ্রহ নামক সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার সময় সংগীতে বহু পরিবর্ত্তন আসে এবং প্রাচীনযুগের সংগীতের পাশাপাশি নবীনযুগের পরিবর্ত্তনশীলতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া লোচন যে গ্রন্থ দুইখানি রচনা করিলেন তাহা দ্বারা সংগীত জগতে যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। তিনি তদীয় গ্রন্থে সাতটি স্বর ও বাইশটি

শ্রুতির বিষয় উল্লেখ করেন এবং ক্রমানুসারে সাতটি স্বরের অন্তর্গত শ্রুতি-সংখ্যা ও বিভাগ নিম্নলিখিত মতে নির্দ্ধারিত করেন।

স্বর	শ্রুতি	স্বর	শ্রুতি
সা	৪	ম	৪
রে	৩	প	৪
গ	২	ধ	৩
		নি	৩
		মোট	২২

তিনি প্রাচীন রাগ-রাগিণী পদ্ধতি পরিহার করিয়া স্বয়ং ঠাট পদ্ধতি প্রবর্ত্তন পূর্বক অনেক রাগ সৃষ্টি করেন এবং ১২টি ঠাট মানিয়া লইয়া রাগসমূহকে ঐ ১২টি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লিখিত গ্রন্থ দুইখানি রচনা করিয়া তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হন। সুপ্রসিদ্ধ সংগীত-গুণী আমিরখসরুর আনুকূল্য তদীয় গ্রন্থলিখিত মত প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে পণ্ডিত লোচনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তিনি দেহত্যাগ করেন।

সুলতান হুসেন শর্কী—চতুর্দ্দশ শতাব্দী

১৩৩৬ ইং সালে জৌনপুরের সুবেদার খাজা ইয়াস তত্রত্য তুগলক-বংশের রাজার দুর্বলতার সুযোগে তথায় নিজে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় ৬০ বৎসরকাল ঐ রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে থাকে। অতঃপর ১৪৫৮ইং সালে সুলতান হুসেন শর্কী যে ভাবেই হউক জৌনপুরের গদীতে বসেন। সে সময় দিল্লীর বাদশাহ বহলোল লোদী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি বাংলা-দেশের রাজার আশ্রয়ে চলিয়া যান ও শেষ জীবন পর্য্যন্ত তথায়ই বসবাস করেন। ১৪৯৯ ইং সনে বাংলাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুলতান হুসেন নিজ বংশের শেষ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংগীতানুরাগী। খেয়াল গানের প্রচার ও প্রসারের প্রতি তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন—এবং এই কারণেই তিনি চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ঐ সময় তিনি খেয়াল গানের গায়কীর মধ্যে একটি পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং জৌনপুরী নামে একটি রাগ সৃষ্টি করেন যাহা অদ্যাবধি ঐ নামে সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে।

———

পণ্ডিত কল্লিনাথ—পঞ্চদশ শতাব্দী

পণ্ডিত কল্লিনাথ দক্ষিণ ভারতের বিজানগরের মহারাজা প্রতাপ দেওজীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে কল্লিনাথের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মহারাজার বিশেষ অনুরোধে কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবকৃত সংগীত রত্নাকরের টীকা "কলানিধি" রচনা করেন। সংগীত রত্নাকরের দুর্বোধ্য বিষয়-বস্তুগুলি কল্লিনাথের টীকা মুল্যে সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ বোধ্য হইয়া ওঠে। রাজা প্রতাপদেও ১৪৫৬—১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়ে পণ্ডিত কল্লিনাথের অভ্যুদয় ঘটে ও তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। রাজদরবারে

সভাপণ্ডিত থাকাকালীন তিনি মহারাজা কর্তৃক "চতুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়া "চতুর কল্লিনাথ" নামে পরিচিত হন। তৎকালীন বহু পণ্ডিত মনে করেন কল্লিনাথ কেবল যে সংগীত রত্নাকরের টীকাই লিখিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি অন্যান্য অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। যদিও অদ্যাবধি সেই সব গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মানসিংহ তোমর—পঞ্চদশ শতাব্দী

সংগীতের ক্ষেত্রে গোয়ালিয়রের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। গোয়ালিয়রের তোমর-বংশীয় নৃপতিগণ চিরদিন সংগীতকলা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। এই কারণে বহু সংগীত ও সাহিত্যিক রাজদরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। এই বংশেই সংগীতগুণী মহারাজা মানসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল ১৪৮৬—১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ। তৎকালে তাঁহার সভায় অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক ছিলেন। তাঁহার মধ্যে বৈজুবাওরা, নায়ক বক্সু, চর্য্যুভগবান, ঘণ্ডু ও রামদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে সুলতানের শেখ বাহাউদ্দিন জ্যাকেরিয়া নানা রাগের মিশ্রণে নূতন নূতন ধুন তৈরী করিতেছিলেন। গুজরাটের সুলতান হোসেনও ভারতীয় রাগের সহিত ইরানী-সংগীতের সংমিশ্রণ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে মহারাজা মানসিংহ জনসাধারণের সংগীতের রুচি যাহাতে মার্জিত হয় এই উদ্দেশ্যে রাজদরবারের গায়কগণ দ্বারা ধ্রুপদের প্রচার ও প্রাচীন-সংগীতকে রক্ষা করার নিমিত্ত নিজেকে নিয়োগ করিলেন।

তিনি তাঁহার সভাগায়ক ও বাদকদিগের সহায়তায় বহু রাগের ব্যাখ্যা সহ "মানকুতূহল" নামক একখানি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফকিরউল্লা ফারসি ভাষায় ঐ গ্রন্থখানির অনুবাদ করেন। মহারাজা ধ্রুপদকে জনসমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; এই কারণে সংগীতজগতে গোয়ালিয়র একটি সংগীত তীর্থ বলিয়া

পরিগণিত হয়। মানকুতূহলে মহারাজ লিখিত পদসমূহ হইতে তদীয় গভীর সাহিত্যিক জ্ঞান ও সংগীতে অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। মানকুতূহল ফকিরউল্লা কর্তৃক "সংগীত দর্পণ" নামে ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়; তাহাতে ফকিরউল্লা রাজা মানসিংহ কর্তৃক ধ্রুপদগানের আবিষ্কার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। মানসিংহের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের নিমিত্ত সংগীতজগৎ তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। ধ্রুপদগানে মহারাজা মানসিংহের সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। কিংবদন্তী আছে যে গোয়ালিয়র হইতে এগার মাইল দূরবর্তী রাই গ্রামে গুর্জরবংশ-জাত মৃগনয়নী নামে একটি পরমাসুন্দরী সংগীত-নিপুণা দরিদ্র বালিকা বাস করিত। মানসিংহ তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। মৃগনয়নীর অনুরোধে তাঁহার জন্য 'গুজরী মহল" নামে একটি পৃথক মহল তৈয়ারী করেন এবং গোয়ালিয়র হইতে রাইগ্রাম পর্য্যন্ত একাদশ মাইল ব্যাপী জলপথ নির্মাণ করেন। মহারাণী সংগীত শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহারাজা মানসিংহ তাঁহার সভাগায়ক বৈজুকে মহারাণীর শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। গুর্জর কুলোদ্ভবা মহারাণীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত বৈজু গুর্জরী তোড়ী ও মঙ্গল গুর্জরী নামক দুইটি রাগ সৃষ্টি করেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মানসিংহ তোমর লোকান্তরিত হন।

চণ্ডীদাস—পঞ্চদশ শতাব্দী

১৩০৯ শকে ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী। প্রাচীন-কালের বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর বাঁশুলী দেবীর (বিশালাক্ষীর) পূজারী নিযুক্ত হন। অদ্যাপি সেই বাঁশুলী দেবীর মন্দির বর্ত্তমান আছে। রজকিনী রামী ঐ মন্দিরের সেবিকা ছিলেন।

চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রতি নিষ্কামভাবে আসক্ত হন এবং তাঁহাকে স্বীয় সাধনার সঙ্গিনী করেন। উভয়ের মধ্যে প্রেমবন্ধন এত দৃঢ় হয় যে চণ্ডীদাসের অনেক গানে রামীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবের পারিপাট্য, ভাষার লালিত্য, রসমাধুর্য্য এবং সুললিত ছন্দের জন্য চণ্ডীদাস বৈষ্ণবপদাবলীর পদকর্ত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। বাংলা ভাষার শৈশবকালে চণ্ডীদাসের এই সরস পদাবলী সৃষ্টি এক বিস্ময়ের বিষয়। চণ্ডীদাস অতি সহজ ও সরল ভাষায় মনের ভাবকে যে ভাবে রূপদান করিয়াছেন এমন আর কেহই পারেন নাই। চণ্ডীদাসের পদ অতি সহজভাবেই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। ইনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের লোক। চণ্ডীদাস কবি বিদ্যাপতির নাম শুনিতে পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হন। ঘটনাক্রমে একদা গঙ্গাতীরে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটে। উভয়েই উভয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হন এবং পরস্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। পদাবলীকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের পদ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলার এই মরমী কবি তাঁহার পদবলীর দ্বারা বৈষ্ণব কুলের অন্তর জয় করেন। তাঁহার রস-মধুর পদের জন্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁহার আসন চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন।

জয়দেব—দ্বাদশ শতাব্দী

বাংলাদেশের অন্তর্গত বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলি) গ্রামে ভক্ত-কবি জয়দেবের জন্ম হয়। অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামা দেবী। জয়দেব অতি অল্পবয়সেই বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বিবাহ করিয়া গৃহবাসী হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তিনি অত্যন্ত গুণী রমণী ছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে পদ্মাবতীর পিতা পদ্মাবতী

সহ জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া পদ্মাবতীকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলে পদ্মাবতীকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া পদ্মাবতীর পিতা চলিয়া যান। জয়দেব পদ্মাবতীকে চলিয়া যাইতে বলেন কিন্তু পদ্মাবতী জয়-দেবকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন এবং অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে অসমর্থ ও চিরদিন জয়দেবের সেবায় জীবন যাপন করিবেন এই সিদ্ধান্ত জানাইলে জয়দেব তাঁহাকে বিবাহ করেন। পদ্মাবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করার পর জয়দেব বিখ্যাত "গীতগোবিন্দ" কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দের ন্যায় সুললিত মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই।

গীতগোবিন্দ রচনা কালে একদা "স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লেখার পর ভাবানুযায়ী পদ যোজনায় অসমর্থ হইয়া পদটি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই জয়দেব স্নান করিতে চলিয়া যান। কিছুক্ষণ পরেই পদ্মাবতী দেখিলেন যে জয়দেব স্নানের পর গৃহে ফিরিয়া গ্রন্থমধ্যে কি লিখিলেন এবং আহারান্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পদ্মা-বতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিতেছেন এমন সময় জয়দেব ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে তাঁহার পূর্বে আহার করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মাবতী বলেন, "এই মাত্র তুমি গ্রন্থে কি লিখিলে ও আহার করিয়া বাহিরে গেলে, আমিতো তোমার প্রসাদ গ্রহণ করিতেছি।" জয়দেব পুঁথি খুলিয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিতার সঙ্গে "দেহি পদ পল্লবমুদারম্" এই কয়টি কথা তাহার নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং বুঝিতে পারেন যে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সংগীতাংশ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। এই অলৌকিক ঘটনা জয়দেব ও তৎপত্নী পদ্মাবতীর অশেষ কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক।

জয়দেব অতিশয় নৃত্যগীত-রসিক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গীত অদ্যাপি দক্ষিণ ভারতের কোন কোন মন্দিরে সুর, তাল, নৃত্য ও ভাব

সহযোগে গীত হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দের গানে রাগ ও তালের নির্দেশ রহিয়াছে। জয়দেব সস্ত্রীক ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটনান্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ বাটীতে গোবিন্দের বিগ্রহ স্থাপন করেন ও শেষ জীবন গোবিন্দ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিজ গ্রামেই দেহরক্ষা করেন।

জয়দেবের স্মৃতি রক্ষাকল্পে প্রতিবৎসর কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলা নামে প্রসিদ্ধ মেলা বসিয়া থাকে।

বৈজুবাওরা—ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দী

বৈজুবাওরার আসল নাম বৈজুনাথ। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর (১৩শ—১৪শ শতক) রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। গুজরাটের অন্তর্গত চাপানি নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে বৈজুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। নায়ক গোপাল লাল তাঁর সমসাময়িক। বৈজুনাথ প্রাচীন ধ্রুপদ-প্রবন্ধ গানের সাধক ও ধারক ছিলেন। তখনো ঠিক খেয়াল গানের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, ধ্রুপদই ছিল অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল প্রবন্ধ গীতরীতির প্রধান অঙ্গ বা উপাদান। বৈজু সংগীতকে জীবনে অধ্যাত্ম সাধনা রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধও হইয়াছিলেন। "বাওরা" অর্থে পাগল, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ও আরাধনায় তিনি পাগল বা একান্ত অনুরক্ত। শোনা যায়, তাঁহার গানে রাগ রাগিণী মূর্ত্তিমান হইয়া বুদ্ধিজীবী মানুষ শুধু নয়, সকল রকম জীবজন্তুদের হৃদয়ও দ্রবীভূত করিত।

শোনা যায় সুলতান আলাউদ্দীনের সভা গায়ক গোপাল নায়ক বৈজুবাওরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে তিনি বৈজুকে গুরু রূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং দৈবদুর্বিপাকে সুলতানের রোষে তাঁহার প্রাণনাশ ঘটে। বৈজুনাথ বা বৈজুবাওরা ভারতীয় সংগীতাদর্শের একজন জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু ধ্রুপদ গান আজও ভারতীয় শিল্পীদের কণ্ঠে বাঁচিয়া আছে।

শ্রীচৈতন্য—পঞ্চদশ শতাব্দী

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও শচীমাতার গর্ভে শ্রীধাম নবদ্বীপে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি কয়েকটি নামেই পরিচিত। মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম রাখা হয় নিমাই। পরে অন্নারম্ভকালে নামকরণ করা হয় বিশ্বম্ভর— উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাঁহার নাম হয় শ্রীচৈতন্য। এই শেষোক্ত নামেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনিই বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রবর্ত্তক। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করেন এবং পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান ধারণা করেন। মতান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের অংশাবতার বলিয়া কথিত হন। কেহ বা বলেন তিনি 'ন চ পূর্ণঃ ন চাংশকঃ' তিনি পূর্ণও নহেন অংশও নহেন।

অল্প বয়সেই তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে তিনি মর্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হন। অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। স্বামী-পুত্র-শোকে অভিভূতা শচীদেবী একমাত্র ভরসাস্থল পুত্র নিমাইকে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবাহ দেন। অল্পকাল মধ্যেই লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। শচীদেবী পুনরায় বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী একটি পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত নিমাইকে বিবাহ দেন। একুশ বৎসর বয়সে নিমাই স্বয়ং চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পাণ্ডিত্যাভিমানী বহু ব্যক্তি তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইতে লাগিলেন অথচ তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে কেহই তাঁহার উপর ক্ষোভ রাখিতে পারিতেন না। একদিন নিমাই ছাত্রগণ সহ গঙ্গাতীরে বসিয়া শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়, এক

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গচ্ছলে নিমাইকে বলিলেন, "ওহে নিমাই, শুনিলাম তুমি নাকি মস্ত পণ্ডিত হইয়াছ।" নিমাই সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, অনুগ্রহপূর্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন আমরা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করি।" আগন্তুক তৎক্ষণাৎ গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইলেন। শ্লোকের দোষগুণ বিচার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে নিমাই শ্লোকের অর্থ ও অলঙ্কারের দোষ দেখাইয়া দিলেন। আত্মাভিমানী আগন্তুক তাহাতে নিমাইকে সরস্বতীর বরপুত্র মনে করিয়া তদীয় পাণ্ডিত্যের নিকট পরাভব স্বীকার করেন এবং অচিরে সে স্থান ত্যাগ করেন।

একদা নিমাই রঘুনাথ শিরোমণি সহ নৌকায় গঙ্গা পার হইতেছিলেন। নিমাইর হস্তে ন্যায়শাস্ত্রের টীকা দেখিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমাই তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, "নিমাই-পণ্ডিতের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে ?" এই কথা শুনিবাত্র নিমাই স্ব কৃত টীকা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন।

কিছুকাল পরে নিমাই পিতৃ-পিণ্ড দানার্থ গয়াধামে যান। তথায় বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিণ্ডদানের পর ঈশ্বরপুরী নামক এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুর সহিত আলাপে নিমাই'র হৃদয়ে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। কিছুদিন মধ্যেই নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার চিত্ত ভক্তি-রসাপ্লুত হইয়া ওঠে ও তিনি দিবারাত্রি হরিনাম জপে মগ্ন থাকেন।

নবজীবন লাভ করিয়া নিমাই গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখন নিমাই-এর কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান ; তিনি কৃষ্ণময় হইলেন এবং ঐ সময় সংসারের কোন বিষয়েই তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না ; এমন কি অধ্যাপনা কার্য্য

পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ, পড়াইবার সময়ও তিনি শুধু হরিকথাই বলিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর এ সময়ে কৃষ্ণ ভক্তিতে পরিপ্লাবিত হইয়া যায়। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

ক্রমে নিমাই সংসারের সকল মায়া ত্যাগ করিয়া হরি-সাধনে নিযুক্ত হইবার জন্য পিপাসিত হইয়া উঠিলেন এবং একদা নিশীথ রাত্রে আপন মাতা শচীদেবী, সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়া ও সহচরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কাটোয়াতে উপস্থিত হইয়া তিনি দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্য শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতের গৃহে যান। সেখানে মাতা শচীদেবী ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর চৈতন্য নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ ও মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। পুরীতে পৌছিবামাত্রই তাঁহার জগন্নাথ দেবকে দর্শনের তীব্র আকাঙ্খা হইল এবং উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া তিনি জগন্নাথদেবকে দর্শন ও স্পর্শ করিলেন এবং ভাবাবেগে জগন্নাথের মন্দিরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া তদীয় ভক্তগণ তাঁহার কানে হরিনাম দিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। পুরীর রাজার সভাপণ্ডিত সার্বভৌমের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইলে ভাগবতের কোনও শ্লোকের ব্যাখ্যা নিয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। সার্বভৌম একটি শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলে চৈতন্যদেব তার অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শোনান, তাহাতে সার্বভৌমের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি চৈতন্যদেবের মতের অনুগামী ভক্ত হইয়া ওঠেন। চৈতন্যদেব এই সময় হইতে স্থায়ী ভাবে নীলাচলবাসী হইলেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ মধ্যে নিত্যানন্দকে দেশে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার

করিতে নির্দ্দেশ দেন। ভক্ত হরিদাস ও অপরাপর দু'একজন ভক্ত তাঁহার সঙ্গেই থাকেন। ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য একবার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতা শচীদেবীর সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ করেন ও ভক্তগণের তাঁহাকে পুনর্বার দর্শন করার বাসনা পূর্ণ করেন। অতঃপর তিনি কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে ভ্রমণ করতঃ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ চিন্তায় বিভোর থাকেন। একদা সমুদ্রের নীল জলরাশি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহা কৃষ্ণের নীল কলেবর জ্ঞানে ঐ নীল সাগরে ঝাঁপ দেন এবং এই ভাবে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে সাগরগর্ভেই তাঁহার তিরোভাব ঘটে।

হরিদাস স্বামী—ষোড়শ শতাব্দী

সংগীতে সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বামী হরিদাসের পিতার নাম আশুধীর ও মাতার নাম গঙ্গা। ইঁহারা সারস্বত ব্রাহ্মণ। পাঞ্জাবের মুলতান জিলায় উচ্চগ্রাম নামক জনপদে তাঁহাদের আদিবাস ছিল। তথা হইতে তাঁহারা উত্তর প্রদেশের আলিগড় জিলায় ক্ষেরওয়ালী সড়ক নামক গ্রামে ক্ষেরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট পুনর্বসতি স্থাপন করেন। তথায় ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গণ্ডগ্রামে হরিদাসের জন্ম হয়। পরবর্ত্তীকালে উক্ত গ্রাম হরিদাসপুর নামে খ্যাত হয়। সাধুসন্তদিগের প্রতি হরিদাসের পিতামাতার অপরিসীম ভক্তি থাকায় তৎপুত্র হরিদাস বাল্যকাল হইতে ভক্তি ও গুণের অধিকারী হন। শৈশবেই সংগীতের প্রতি হরিদাসের গভীর অনুরাগ জন্মে। কিছুকাল মধ্যেই তাঁহার সংগীত কৃষ্ণভক্তিরসে মিশ্রিত হইয়া এক অনির্বচনীয় রূপ ধারণ করে। ১৫ বৎসর বয়সেই তিনি বৃন্দাবনে যান এবং নিধুবনে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় তাঁহার ভক্তি-সিঞ্চিত সংগীতের রসধারায় সমস্ত বৃন্দাবন ভূমি প্লাবিত হয়। তিনি বৃন্দাবনের

তৎকালীন প্রচলিত ব্রজভাষায় শাস্ত্রীয় রাগ ও তালে বহু ধ্রুপদ গান রচনা করেন এবং সেই সংগীত শ্রবণে বৃন্দাবনবাসী মাত্রই মুগ্ধ হন ও অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে নিম্নোক্ত সংগীতজ্ঞগণের নাম "নাদ বিনোদ" গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে—বৈজু, গোপাল নায়ক, মদনরায়, রামদাস, দিবাকর পণ্ডিত, সোমনাথ পণ্ডিত, তন্না মিশ্র (তানসেন) ও রাজা সৌরসেন।

স্বামীজী রচিত বহু গান সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাবধিও আছে। "সংগীত কল্পদ্রুম" গ্রন্থে তাঁহার রচিত বহু গান পাওয়া যায়। আজকাল ব্রজধামে যে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় তাহা তিনিই প্রচলিত করেন। ঐ রাসলীলাতে যে সংগীত গাওয়া হয় তৎসমুদয় স্বামীজীরই রচনা। স্বীয় শিষ্যবর্গ ভিন্ন অপর কাহারো সান্নিধ্যে তিনি কখনও গান গাহিতেন না। কিন্তু ভারতীয় অনেক রাজা বাদশাহ তাঁহার গান শুনিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে আসিতেন ও স্বামীজীর কুটিরের পার্শ্বে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন। একদা দিল্লীশ্বর আক্‌বর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে স্বামীজীর গান শুনিতে বৃন্দাবনে যান এবং কুটিরের বাহিরে থাকিয়া স্বামীজীর গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। আক্‌বর বাদশাহ তখন স্বামীজীর নিকট নিজ পরিচয় প্রদান পূর্বক তাঁহাকে দিল্লীতে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান কিন্তু স্বামীজী বাদশাহের সেই অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

নায়ক, বৈজু, তানসেন প্রভৃতি স্মরণীয় সংগীতজ্ঞগণের গুরু স্বামীজী যে কত উচ্চস্তরের গায়ক ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় দান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বৃন্দাবনে প্রতি বৎসর হরিদাস স্বামীর তিরোভাব তিথি সংগীত-উৎসবের মাধ্যমে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ঐ উৎসবোপলক্ষ্যে সংগীতজ্ঞগণ তাঁহারি রচিত

সংগীত গাহিয়া থাকেন। সেই উৎসবের সময় স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিষ-পত্রাদি জনগণ সমক্ষে উপস্থিত করা হয়—স্বামীজীর ব্যবহারের ভোজন পাত্র ইত্যাদি তাহার মধ্যে রহিয়াছে। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৯৫ বৎসর বয়সে স্বামী হরিদাস বৃন্দাবনস্থিত নিধুবনে দেহ-রক্ষা করেন। তথায় অত্যাপি সমাধি বর্ত্তমান আছে।

তানসেন—ষোড়শ শতাব্দী

গোয়ালিয়র হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী বেইট নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে মুকুন্দরাম পাণ্ডে (মকরন্দ পাণ্ডে) নামে এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সুপণ্ডিত ও খ্যাতনামা গায়ক ছিলেন। তিনি বারাণসীতে ছিলেন—তথায় কথকতা করিতেন। তাঁহার পত্নী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন। পুত্র তানসেনের জন্মের পূর্বে তাঁহাদের অনেক সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু সকল সন্তানই পর পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পত্নীর মৃতবৎসা দোষ থাকায় মুকুন্দরামের মনে বড়ই দুঃখ ছিল। যাহা হউক মুকুন্দরাম সংবাদ পান যে গোয়ালিয়রে মহম্মদ গউস নামে এক সিদ্ধ পীর মৃতবৎসা দোষ দূর করিতে পারেন। মুকুন্দরাম উক্ত পীরের শরণাপন্ন হইলে পীর সাহেব তঁাহাকে একটি কবচ দেন। মুকুন্দরামের পত্নী ঐ কবচ ধারণ করিলে ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে তানসেন (তন্না মিশ্র অথবা রামতনু) এর জন্ম হয়। উক্ত জন্ম-সাল সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। ঐ সাল কাহারো মতে ১৫২০, কাহারো মতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

বাল্যকালে তানসেন তাঁহার পিতামাতার সহিত বারাণসী ধামে বাস করিতেন। বালক তানসেনের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। তিনি বিভিন্ন জীবজন্তুর আওয়াজ ও যে-কোনও স্বর অনায়াসে অনুকরণ করিতে পারিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এই সময় স্বামী হরিদাস শিষ্যমণ্ডলী সহ

বারাণসী তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বারাণসী সহরের সীমায় আসিয়া পৌঁছান তখন বালক তানসেন নিকটেই বনের ধারে গরু চরাইতে ছিলেন। শিষ্য পরিবৃত সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া বালক তানসেন একটি বৃক্ষের আড়াল হইতে কৌতুকছলে ব্যাঘ্রের আওয়াজ করিতে শুরু করেন। এই আওয়াজে শিষ্যগণ অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু স্বামীজী শিষ্যগণকে এই আওয়াজ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অনুসন্ধান লইতে নির্দ্দেশ দেন। শিষ্যগণ অত্যল্প সময় মধ্যেই বৃক্ষের আড়ালে বালকটিকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। স্বামীজী ঐ বালকের রূপলাবণ্য ও সিদ্ধজনোচিত লক্ষণাদি দেখিয়া এবং তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া বালক তানসেনসহ তাঁহার পিতা মুকুন্দরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তানসেনকে সঙ্গীত শিক্ষা দানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মুকুন্দরাম সানন্দে আপন পুত্র তানসেনকে স্বামীজীর হস্তে অর্পণ করেন। দশ বৎসর বয়স্ক তানসেনকে লইয়া স্বামীজী বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই ভাবে অমর গায়ক তানসেনের সঙ্গীত-জীবনের সূত্রপাত হয়। একাদিক্রমে দশ বারো বৎসর কাল স্বামীজীর নিকট একনিষ্ঠভাবে সঙ্গীত-শিক্ষা লাভ করিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা গোয়ালিয়রে মরণাপন্ন আছেন সংবাদ পাইয়া তানসেন গুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোয়ালিয়রে পিতার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মুকুন্দরাম তানসেনকে বলিলেন, "আমি যাঁহার কৃপায় তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি, আমার মৃত্যুর পর তুমি সেই পীর সাহেব মহম্মদ গউসের সহিত অবশ্য সাক্ষাৎ করিও।" পিতার আদেশানুসারে তানসেন পিতার মৃত্যুর পর যথাসময়ে পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পীরসাহেব মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় অতুল সম্পত্তি তানসেনকে দান করিয়া যান।

অনতিকাল মধ্যেই গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহের বিধবা পত্নী মৃগনয়নীর সহিত তানসেনের পরিচয় ঘটে। রাণী তানসেনের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ও তৎপ্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রীতিপরায়ণা হন। এই সময় রাণী মৃগনয়নী প্রতিষ্ঠিত সংগীত বিদ্যাপীঠের বিদ্যার্থিনী সুকণ্ঠী জনৈকা হুসেনী ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি তানসেন আকৃষ্ট হন। এই ব্রাহ্মণ কন্যার পিতা ছিলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ। তিনি সপরিবারে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিলে তদীয় কন্যা প্রেমকুমারী "হুসেনী ব্রাহ্মণী" বলিয়া পরিচিত হন। রাণী মৃগনয়নীর মধ্যস্থতায় এবং পীর সাহেব মহম্মদ গউসের পৌরোহিত্যে ইহার সহিত তানসেনের বিবাহ সংঘটিত হয়। বিবাহের পূর্বে তানসেনকে স্বভাবতঃই ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া আতা আলী খাঁ নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বিবাহে মহারাণী মৃগনয়নী এবং পীর সাহেব তানসেনকে যথেষ্ট ধন-রত্ন যৌতুক হিসাবে দান করেন। বিবাহের পর তানসেন পুনরায় বৃন্দাবনে গুরুদেব স্বামী হরিদাসের সহিত মিলিত হন এবং বিবাহাদি যাবতীয় বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করেন। উদার দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজী তানসেন ও আতা আলী খাঁর মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইলেন না। এবং পূর্বের ন্যায়ই যত্নসহকারে তাঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন এবং শিক্ষা দান কার্য সম্পূর্ণ করেন। তানসেন মুসলমান হইয়াও প্রগাঢ় গুরুভক্তি হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইলেন না। গুরুর দীক্ষা ও শিক্ষা তাঁহাকে সঙ্গীত সাধনার উচ্চতম শিখরে উন্নীত করিয়াছিল।

তানসেন গুরুর নিকট হইতে শতাধিক ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন এবং গুরুর নিকটই যৌগিক উপায়ে স্বর-সাধনার কৌশল প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীতে যোগসিদ্ধ হন। রেওয়ার মহারাজা রাজারাম বৃন্দাবন ধামে তানসেনের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়া স্বীয় দরবারে সভাগায়ক নিযুক্ত করেন। উক্ত সময়ে তানসেন রাজারামের নামে বহু গান রচনা করেন। তৎকালে দিল্লীর

সিংহাসনে বাদ্‌শাহ আকবর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা-রামের গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আকবর একদা রেওয়া রাজ্যে আসেন ও তানসেনের গানে তিনি এত আত্মহারা হন যে রাজারামকে অনুরোধ করিয়া তানসেনকে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে আনিয়া সসম্মানে স্বীয় দরবারে গায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আকবর বাদশাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপন দরবারের নবরত্ন মধ্যে তানসেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের মর্য্যাদা দান করেন। তানসেন যে দরবারের শুধু শ্রেষ্ঠতম রত্নই ছিলেন তাহা নহে, আকবরের সর্বাধিক অন্তরঙ্গ মিত্রও ছিলেন। প্রভাতকালে ও সন্ধ্যায় কি দরবারে কি অন্তঃপুরে তানসেনের সঙ্গীত ছিল আকবরের নিত্যসঙ্গী। তানসেন ভিন্ন আকবরের এক মুহূর্ত্তও চলিত না। তানসেনের গান শুনিতে শুনিতে একদা আকবর এমন আত্মহারা হইয়া পড়েন যে পারিতোষিকস্বরূপ স্বীয় কণ্ঠের মণিহার তানসেনের কণ্ঠে পরাইয়া দেন ও তাঁহাকে তানসেন উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

তানসেনের জীবনকে আশ্রয় করিয়া বহু গল্প বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আকবরের সভার অপরাপর গায়কগণ তানসেনের প্রতি বাদশাহের অযাচিত অনুগ্রহে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং তানসেনকে নির্য্যাতন করিবার নিমিত্ত এক ষড়যন্ত্র করেন। দীপক রাগ গাহিলে শরীরে অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া জীবন নাশ করিতে পারে এবং সিদ্ধ গায়ক ভিন্ন অপরের পক্ষে এই রাগ গাওয়া সুসাধ্য নহে এই কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং দুরভিসন্ধি মূলে তাঁহারা তানসেন দ্বারা দীপক রাগ গাওয়াইবার নিমিত্ত বাদশাহকে পীড়াপীড়ি করিলে তানসেন ঐ রাগের প্রাণনাশী শক্তির বিষয় আকবরকে জানাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও আকবর ঐ রাগ শুনিবার জন্য জেদ করেন। আকবর কর্ত্তৃক দীপক রাগ গাহিতে এই ভাবে আদিষ্ট হইয়া তানসেন গাহিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত

বায়ুমণ্ডল তখন এত উত্তপ্ত হইয়া ওঠে যে বাদশাহ স্বয়ং এবং দরবারের অপরাপর গায়ক, বাদক ও যাবতীয় শ্রোতৃগণ তথা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া নিজ নিজ প্রাণ বাঁচান। তানসেন আপন প্রাণরক্ষার্থে দ্রুত নিজ বাটীতে গমন করিলে তাঁহার কন্যা সরস্বতী ও তদীয় গুরুভগ্নী রূপবতী মেঘ রাগ গাহিয়া তানসেনের প্রাণ রক্ষা করেন। প্রাণ রক্ষা পাইলেও তানসেন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। ইহাতে আকবর নিজের ভুলের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন।

আরও একটি গল্প প্রচলিত আছে যে—একদা আকবর তানসেনকে বলেন, "তানসেন, তুমি এত মধুর গান কর, তোমার গুরুদেবের গান আরও কত মধুর, আমি তাঁহার গান শুনিতে ইচ্ছা করি।" তানসেন বলিলেন, "আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেই স্বামীজীর গান শোনা সম্ভব হইবে।" বাদশাহ তাহাতেই রাজী হইয়া তানসেনসহ বৃন্দাবনে যান এবং ছদ্মবেশে স্বামীজীর গান শোনেন। গান শুনিয়া আকবর এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে স্বামীজীকে প্রচুর ধনরত্ন দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দিল্লী যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বামীজী বিষয় ও অর্থের সহিত সম্পর্কহীন সন্ন্যাসী বলিয়া ধনরত্ন গ্রহণ করিলেন না এবং দিল্লী যাওয়ার জন্য অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। আকবর তানসেনসহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তানসেনের জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এরূপ জানা যায় যে আকবর একদা বেলা দ্বিপ্রহরে রাত্রিকালীন কোন রাগ গাহিবার জন্য তানসেনকে অনুরোধ করেন। তানসেন সঙ্গীত আরম্ভ করিলে সেই স্থান নৈশ অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যায় এবং গানের স্বর যতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল ততদূর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তানসেনের সঙ্গীতে বহু প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি দূরীভূত হইত বলিয়া শোনা যায়। এরূপ বহু কিংবদন্তী বর্ত্তমান আছে।

সুরৎসেন, শরৎসেন, তরঙ্গসেন ও বিলাত খাঁ নামে তানসেনের চারি পুত্র ও সরস্বতী নামে এক কন্যা ছিল। সিংহল গড়াধিপতি সমুখন সিংহের পুত্র আকবর বাদশাহের সভার প্রসিদ্ধ বীণকার মিশ্রী সিংহের ইস্লামী নাম হয় নওয়াৎ খাঁ। তানসেনই এই নামকরণ করেন। তানসেনের পুত্রগণ সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তানসেনের অনুরোধে আকবর বাদশাহ তানসেনের পুত্রগণকে আপন দরবারে নিযুক্ত করেন এবং প্রত্যেকের মাসিক বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বিলাস খাঁ-ই বিশেষ ব্যুৎপন্ন বলিয়া আকবরের সমধিক প্রিয় পাত্র হন। এই সময় তানসেন আকবর বাদশাহের দরবার হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বাদশাহ তানসেনকে মাসিক দুই হাজার টাকা অবসর-কালীন বৃত্তি দিতেন। তানসেন ক্রমে জরা ও বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইয়া অন্তিম দশায় উপনীত হইলে চারি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার শবের পার্শ্বে বসিয়া গান করিও। তখন যাহার গানের সময় আমার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত হইবে, তাহারই বংশে সঙ্গীত সাধনা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে জানিও।" অতঃপর তানসেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহকে ঘিরিয়া তদীয় পুত্রগণ অপরাপর গুণীদিগের সহিত গান গাহিতে থাকেন। কিন্তু সকলেরই গান ব্যর্থ হয়। সর্বশেষে তানসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিলাস খাঁ টোড়ী রাগিণীর "কউন ভ্রম ভুলো রে মন অজ্ঞানী" ধ্রুপদ গানটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তানসেনের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত হয়—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে অশীতিবৎসর বয়সে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক তানসেনের আত্মা অমর ধামে প্রয়াণ করে। যশের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াও তানসেন ছিলেন নিরহংকার। ধর্মাশ্রয়ী শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-সাধক তানসেন সঙ্গীতজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

তানসেনের মৃত্যু হয় দিল্লীতে, কাহারো কাহারো মতে আগ্রায়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাদশাহের নিকট গোয়ালিয়র যাইবার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে আশঙ্কায় বাদশাহ তাঁহাকে গোয়ালিয়র যাইতে দেন নাই। যাহা হউক তানসেনের শেষ ইচ্ছানুসারে গোয়ালিয়রে তাঁহার শব লইয়া গিয়া পীর মহম্মদ গউসের কবরের নিকট সমাহিত করা হয়। বাদশাহ তাঁহার কবরের উপর একটি চন্দ্রাতপ তৈয়ার করিয়া দেন। ইহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। তানসেনের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিবৎসর তাঁহার কবরের নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠগায়কগণ মিলিত হইয়া তানসেন রচিত গান গাহিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট যন্ত্রীগণ যন্ত্রাদি বাজাইয়া থাকেন। তানসেনের কবরের উপরেই একটি তেঁতুল বৃক্ষ আছে। গায়কদিগের বিশ্বাস, ঐ তেঁতুল পাতা খাইলেই গলার স্বর সুমিষ্ট হয় —এই বিশ্বাসে বহু গায়ক ঐ তেঁতুল পাতা খাইয়া থাকেন। তানসেন বহু রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দরবারী কানাড়া, মিঞা কি তোড়ী, মিঞা কি মল্লার, মিঞা কি সারঙ্গ ইত্যাদি নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ধ্রুপদ গানকে অতি উচ্চস্তরে উন্নীত করেন। সর্বভারতে তাঁহার গান ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু সঙ্গীত-সাধক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে খোদাবক্স, মসনদ আলী খাঁ, রামদাস, সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, দরিয়া খাঁ, মহবৎ খাঁ, খাণ্ডে রাও, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, রমজান্, লাল খাঁ, নিজাম খাঁ, হুসেন খাঁ, শোভা খাঁ, বীর মণ্ডল, মলিল খাঁ, চঞ্চল শশী, ভীম রাও, তাজ বাহাদুর, ভগবান দাস, তান তরল, মান তরল ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত তান তরল ও মান তরল তানসেনের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন এবং তানসেন তাঁহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তানসেনের পুত্রগণ ও জামাতা মিশ্রী সিং তানসেনের শিষ্যগণ অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানের যাবতীয় গায়ক ও বাদক উত্তরাধিকার সূত্রে

তানসেনের সঙ্গীতের কিছু না কিছু পাইয়াছেন। তানসেন কণ্ঠ-সংগীতের গায়ক হইলেও যন্ত্র-সঙ্গীতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রবাব বা রুদ্রবীণা তাঁহারই সৃষ্টি। তানসেন এই যন্ত্রের মাত্র স্রষ্টাই নহেন তিনি স্বয়ং রবাব যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বাদকও ছিলেন। তান-সেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ পিতার ন্যায় একজন উৎকৃষ্ট রবাবী ছিলেন।

তানসেন-দুহিতা সরস্বতী ও তাঁহার স্বামী মিশ্রী সিং এই দুইটি সঙ্গীত প্রতিভার মিলনে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শাহ সদারঙ্গ, নির্মল শাহ ও উজীর খাঁর ন্যায় সঙ্গীতের যুগপ্রবর্ত্তকদিগের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল।

উজীর খাঁ তানসেনের দৌহিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রামপুর দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বীণকার ছিলেন। তাঁহার বংশধর-গণের মধ্যে পৌত্র ধ্রুপদীয়া ও বীণকার ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেব এখন বর্ত্তমান আছেন।

মীরাবাঈ—ষোড়শ শতাব্দী

রাজস্থানের যোধপুর রাজ্যের কুড়কী গ্রামে ১৫৫৫ মতান্তরে ১৫৫৬ সম্বতে রাঠোর বংশে তাঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে ইনি মাতার সহিত কোন একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়াছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া মা'কে জিজ্ঞাসা করেন "আমার বর কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে মাতা গৃহস্থিত শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি দেখাইয়া বলেন, "এই যে তোমার বর।" সেই হইতেই মীরা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণ সেবায় মন প্রাণ অর্পণ করিলেন। শৈশবেই মীরার মাতৃবিয়োগ ঘটে। অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী অশেষ সদ্‌গুণশালিনী ও পরম-ভক্তিমতী মীরা বিবাহ-যোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে ১৫৭৬ সম্বতে মেবারের রাণা ভোজরাজ মতান্তরে রাণাকুম্ভের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর অতুল বৈভব রাজ-ঐশ্বর্য্য এবং রাজরাণীর আসনের অধিকারিণী হইয়াও এই

সকলের প্রতি মীরার কোনও আসক্তি হওয়া দূরে থাকুক, তিনি উদাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিবাহ হইলেও একমাত্র গিরিধারীলালকেই প্রভুজ্ঞানে তাঁহার সেবা পূজায় নিমগ্ন থাকিয়া একতারা ও করতাল সহযোগে নৃত্য-সহকারে ভক্তি-সঙ্গীত এবং সাধু সন্তের সঙ্গে ভজন গান করিতেন।

মীরার এই প্রকার বৈষ্ণবোচিত আচার আচরণ রাজান্তঃপুরে সকলেরই বিতৃষ্ণার কারণ হইয়া উঠিল। মেবারের রাজবংশ শাক্ত ছিল সুতরাং রাজমাতা এবং স্বয়ং রাণা মীরার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। রাজ-পরিবারের অভ্যন্তরে ও বাহিরে মীরার এতাদৃশ আচরণে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। মীরাকে গিরিধারীলালের সেবা পূজা ত্যাগ করিয়া শক্তি পূজায় রত হইবার জন্য বলা হইল; কিন্তু মীরা উক্ত প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়া পানীয় বলিয়া এক পেয়ালা বিষ মীরাকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু গিরিধারীলালের কৃপায় বিষ পান করিয়াও মীরাবাঈ-এর মৃত্যু ঘটে নাই।

অতঃপর রাণা উত্তেজিত হইয়া মীরাকে গিরিধারীলালের উপাসনা পরিহার করিতে অন্যথায় রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলে মীরা দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করিলেন। রাজরাণী মীরা রাজপুরী হইতে নিক্রান্ত হইয়া ভিখারিণীর বেশ ধারণ পূর্বক কতককাল দীনজনের সেবায় অতিবাহিত করেন। তাহার পর তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যান। ব্রজভূমিতে গোবিন্দের গুণগান করিয়া কয়েক বৎসর কাটান এবং পরে দ্বারকাধামে উপনীত হইয়া রণছোড়জীর মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় নিত্যই প্রাণের আকুল আবেগ ও গভীর ভক্তি-সহকারে প্রিয়তম রণছোড়জীকে ভজন গান শুনাইতে থাকেন। এই সময় হরিভক্তি পরায়ণা মীরার নাম সর্ব্বভারতে ছড়াইয়া পড়ে। এই সংবাদ মেবারে পৌঁছিলে রাজ-পরিবারবর্গ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারেন এবং মীরাকে পুনরায় সসম্মানে মেবারে পাঠাই-

বার নিমিত্ত দ্বারকাস্থিত ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। কিন্তু মীরা রণছোড়জীর মন্দির পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে মীরাকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত যখন অত্যধিক পীড়াপীড়ি করা হইতেছিল তখন মীরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইয়া ভজন গান করিতে থাকেন এবং রণছোড়জীর বিগ্রহের সহিত লীন হইয়া যান। (১৬৩০ বিক্রম—ইংরাজী ১৫৭৩)।

সুরদাস—ষোড়শ শতাব্দী

ভক্ত সুরদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। কাহারও মতে মথুরা জিলান্তর্গত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী পরসৌলী নামক একটি প্রাচীন গণ্ড গ্রামে (১৫৩৫ বিক্রমে বা ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে সুরদাসের জন্ম হয়। মতান্তরে হরি রায় সম্পাদিত "চৌরাশি বৈষ্ণবগণ কী বার্ত্তা" গ্রন্থে দিল্লী মথুরা রোডের সংলগ্ন বল্লভগড় হইতে একক্রোশ মধ্যে "সীহী" গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে সুরদাস জন্মান্ধ ও অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কথিত আছে যে মাত্র ছয় বৎসর বয়সে অন্ধের সম্বল একটি যষ্ঠি হস্তে ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে পৌঁছাইয়া তিনি একটি পিপুল বৃক্ষতলে আশ্রয় নেন। তথায় সাধু-সন্তগণ প্রায়শঃই আসিতেন। সুরদাস তাঁহাদের নিকট ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশ শুনিতে পাইতেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতেই সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভজন সঙ্গীতে চর্চা করিতে লাগিলেন। আশৈশব তিনি সুমধুর সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার গান সকলকেই মুগ্ধ করিত। অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি তথায় ছিলেন। অতঃপর তিনি মথুরা আগ্রা রোডের নিকটবর্ত্তী "গোঘাট" গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় অদ্যাপি

"সুর-কুঠি" নামে একটি কুটীর সুরদাসের স্মৃতি বহন করিতেছে। গোঘাটে থাকাকালে তিনি ভগবদ বিষয়ে বহু ভজন গান রচনা করিয়া গাহিতেন। এই সময়ে একদা বল্লভাচার্য্য নামে এক বৈষ্ণব প্রধান তথায় আগমন করিয়া সুরদাসের বিনয়গর্ভ ভগবৎ বিষয়ক ভজন সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া সুরদাসকে দীক্ষা দান করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান রচনা করিতে উপদেশ দেন। দীক্ষা গ্রহণান্তে গুরু বল্লভাচার্য্যের সহিত তিনি গোকুলে চলিয়া যান। গোকুল হইতে একসঙ্গে তাঁহারা গোবর্দ্ধনে গমন করেন এবং সুরদাস তত্রত্য শ্রীনাথজীর মন্দিরে গায়ক নিযুক্ত হন। কিছুদিন মধ্যেই অনতিদূরবর্ত্তী পরসোলী গ্রামে সুরদাস বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় বস-বাসের কাল হইতে শেষ জীবন পর্য্যন্ত সুরদাস অসংখ্য ভজন গান রচনা করেন। "সুরসাগর" গ্রন্থে সুরদাস রচিত সহস্রাধিক ভজন গান রহিয়াছে এবং উক্ত গীত-সমূহ মধ্যে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত গাহিবার উপযোগী নানা রাগ-রাগিণী ও বিভিন্ন তালের সমাবেশ লক্ষিত হয়। ব্যাকরণের দিক হইতেও তাঁহার সঙ্গীতের ভাষা নির্দ্দোষ ছন্দ বিশিষ্ট ছিল। সুরদাস ভক্ত, কবি এবং গায়ক ছিলেন; একাধারে এই তিনটি গুণের সমাবেশ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। উত্তর ভারতের ভজন-গীতি রচয়িতাগণ মধ্যে সুরদাস সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুরদাসের ভজনের ভক্তিভাব যে কোনও ব্যক্তির হৃদয়কে এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব রসে সিক্ত করে। সুর-সাধক সুরদাস আনুমানিক ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন।



সোমনাথ—ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজমহেন্দ্রী নগরে পণ্ডিত সোমনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুদ্রল পণ্ডিত। তিনি দানবীর, ধর্মনিষ্ঠ ও বিদ্বান ছিলেন। সোমনাথ কেবল সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন না উপরন্তু সংগীত-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার সময় সংগীত শাস্ত্র ও তৎকালে প্রচলিত সংগীত পদ্ধতির মধ্যে মতভেদ ছিল। প্রচলিত সংগীত পদ্ধতির সংস্কার সাধনের জন্য তিনি আনুমানিক ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে "রাগ বিবোধ" নামক সংগীতগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। জন-সাধারণের নিকট ইহাকে সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি স্বয়ং ইহার টীকা লিখিয়া নিজের গ্রন্থোক্ত মতের সমর্থনে অপরাপর সংগীত গ্রন্থের মত উল্লেখ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বীণবাদক ছিলেন এবং "রাগ বিবোধ" গ্রন্থে বীণা বাদন সম্বন্ধে নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। দক্ষিণ দেশীয় সংগীত বিষয়ে ইহা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইনি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন এবং সংগীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পণ্ডিত অহোবল—সপ্তদশ শতাব্দী

বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ "সংগীত পারিজাত" রচয়িতা পণ্ডিত অহো-বল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণের মতে তিনি দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তদীয় পিতা পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ, পুত্র অহোবলকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান করেন। অতঃপর অহোবল সংগীত শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া ঘনবড়-নগরে বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময়ে তিনি উত্তর ভারতীয়

সংগীতে মনোনিবেশ করেন এবং লোচন পণ্ডিত ও অপরাপর পণ্ডিতগণ-লিখিত সংগীত শাস্ত্র পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ক্রমে তিনি উত্তর ভারতীয় সংগীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঘনবড় নগরের রাজা অতিশয় সংগীতপ্রিয় ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি গুণীদের সমাদর জানিতেন। পণ্ডিত অহোবলের সংগীত-দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি পণ্ডিত অহোবলকে তাঁহার দরবারের গায়ক নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত অহোবল উত্তর ভারতীয় সংগীতকে কেন্দ্র করিয়া প্রসিদ্ধ সংগীতগ্রন্থ "সংগীত পারিজাত" রচনা করেন। এই গ্রন্থ-খানিকে উত্তর ভারতের পণ্ডিতগণ সংগীতের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতিদান করিয়াছেন। বীণার তারের উপরে ১২টি স্বরের স্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত অহোবলই এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ ইহা মানিয়া লইয়াছেন।

পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী—সপ্তদশ শতাব্দী

পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী "চতুর্দণ্ডিপ্রকাশিকা"র গ্রন্থকার। তাঁহার অপর নাম ব্যঙ্কটেশ, পিতার নাম গোবিন্দ দীক্ষিত এবং মাতার নাম নাগ-মাম্বা। উক্ত গোবিন্দ দীক্ষিত নায়ক বংশের শেষ রাজা বিজয় রাঘবের দেওয়ান ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরে। ঐতিহাসিকদের মতে রাজা বিজয় রাঘব ১৬৬০ ইং সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই রাজা সাহিত্য ও ললিতকলানুরাগী ছিলেন। তিনি পণ্ডিত ব্যঙ্কটেশকে আপন দরবারে গায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি গভীর সংগীত সাধনা ও অনুকূল পরিবেশ এই দুইটির সহায়তায় ব্যঙ্কটেশ চতুর্দণ্ডি-প্রকাশিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতে সংগীত শাস্ত্রের মধ্যে ব্যঙ্কটেশের রচিত গ্রন্থ শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। ব্যঙ্কটেশের গুরুর নাম শ্রীতানপ্পাচার্য্য।

ইনি গুরু পরম্পরায় শার্ঙ্গদেবের সম্পর্কিত। ব্যঙ্কটেশ তদীয় গুরুর নিকট সম্যক অধ্যয়ন ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আরভী রাগে গুরু বর্ণন বিষয়ে "গান্ধর্ব জনতা ধর্ব" নামে এক গীত রচনা করেন। এই গীত আজও পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঞ্জোর রাজ্যে এই সংগীতবিদের মৃত্যু হয়। উক্ত পণ্ডিত ব্যঙ্কটেশই পরে পণ্ডিত ব ঙ্কটমখী নামে পরিচিত হন।

দামোদর – সপ্তদশ শতাব্দী

পণ্ডিত দামোদরের পিতার নাম পণ্ডিত লক্ষ্মীধর। দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ই (১৬২৫ ইং) পণ্ডিত দামোদরের আবির্ভাবকাল। ঐ সময়েই তিনি সংগীত দর্পণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ছয়টি অধ্যায়ে তিনি সংগীতের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। অধ্যায়সমূহের নাম যথা—স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রবন্ধধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, তালাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বরসমূহকে তথা শ্রুতিস্থান বিষয়ে বিশেষ মহত্ব দেওয়া হইত না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত দামোদর 'সা' ও 'পা'কে অচল স্বর মানিয়া লইয়া সংগীতে বহু পরিবর্ত্তন সাধন করেন। তাঁহার বংশের পূর্বপুরুষগণ বা তাঁহার নিজের নিবাসস্থান সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। পণ্ডিত দামোদর-রচিত "সংগীত দর্পণ" ফার্সি, গুজরাটি ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস—অষ্টাদশ শতাব্দী

সঙ্গীতবিদ্বান শ্রীনিবাস "রাগতত্ত্ববিবোধ" নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হন। অহোবল লিখিত সুবিখ্যাত সঙ্গীত-গ্রন্থ সঙ্গীত পারিজাতের অস্পষ্ট ও বিনষ্ট অংশগুলিকে শ্রীনিবাস তদীয় রাগতত্ত্ববিবোধ গ্রন্থে যথাক্রমে স্পষ্ট ও উদ্ধার করিয়া সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাগে ১২টি স্বরের প্রয়োগ তিনি সমর্থন করিয়া স্বীয় মতের পূর্ণ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীনিবাস পণ্ডিত অহোবলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই চলেন। তাঁহার কাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলিয়াই অনুমিত হয় এবং ঐ সময়েই তাঁহার রাগতত্ত্ববিবোধ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাস নরপতিপুরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ চুরি করার বিদ্যায় পাকা হইয়া উঠেন। এই ভাবে বহু মূল্যবান সঙ্গীত-গ্রন্থ তিনি একত্রিত করেন। একদা তাঁহার গ্রন্থাগারে আগুন লাগিয়া সকল গ্রন্থ বিনষ্ট হয়। এই কারণে শ্রীনিবাসের প্রায় উন্মাদ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু ব্যঙ্কট রাজা একজন দক্ষিণী পণ্ডিত দ্বারা তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া তদ্দ্বারা একটি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার মনে শান্তি ফিরাইয়া আনেন। শ্রীনিবাস বরাবর জনসমাজ হইতে দূরে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না।

সদারঙ্গ (নিয়ামত খাঁ)—অষ্টাদশ শতাব্দী

তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় লালখাঁর পুত্র বিখ্যাত বীণকার ও গায়ক, নিয়ামত খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিই সদারঙ্গ নামে পরিচিত। বহু খেয়াল গানে "সদারঙ্গিলে মহম্মদ শা" এরূপ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমীর খসরু প্রবর্ত্তিত খেয়াল গান তাঁহার সময়ে জনপ্রিয় হয় নাই। খেয়াল গানকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান

হুসেন শকী, রাজ বাহাদুর, চঞ্চল সেন, চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ প্রভৃতি সংগীত গুণীগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেন নাই। নিয়ামত খাঁ তাঁহাদের এই অসাফল্যের কারণ উপলব্ধি করেন। তিনি অনেক চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গীত-রচনার মধ্যে বাদশাহের নামের উল্লেখ থাকিলে বাদশাহের আনুকুল্যে খেয়াল গান প্রচারের সুবিধা হইবে। ঐ সময়ে তানসেনের পুত্র-বংশীয় গায়ক এবং রবাবী গোলাব খাঁ মহম্মদ শাহের সংগীত গুরু রূপে দরবারে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোলাব খাঁ যখন দরবারে গান গাহিতেন তখন বাদশাহের নির্দ্দেশে নিয়ামত খাঁকে ঐ গানের সঙ্গে বীণা সঙ্গত করিতে হইত। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নিয়ামত খাঁ দরবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহার পর ঘটনা অন্যরূপ ধারণ করিল।

একদা পথিমধ্যে মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট দুইটি ভিক্ষুক বালকের গান শুনিয়া নিয়ামত খাঁ মুগ্ধ হইয়া যান এবং উক্ত বালকদ্বয়কে স্বীয় বাসস্থানে আশ্রয় দেন ও তাহাদিগকে ক্রমাগত দুই বৎসরকাল সযত্নে খেয়াল গান শিক্ষা দেন। মহম্মদ শাহ মন্ত্রী মুখে উক্ত ভিক্ষুক বালকদ্বয়ের সংগীতের সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে দরবারে গান গাহিবার জন্য আহ্বান করেন। উক্ত বালকদ্বয়ের অভিনব প্রণালীর গানে বাদশাহ মুগ্ধ ও অভিভূত হন। নিয়ামত খাঁ তাহাদের গুরু ইহা জানিতে পারিয়া বাদশাহ নিয়ামত খাঁকে সাদর আহ্বান জানান ও তাঁহাকে স্বীয় দরবারে শ্রেষ্ঠ গুণীর আসন দান করেন। দরবারে পুনঃ প্রবেশের পর নিয়ামত খাঁ যে সম্মান লাভ করিলেন সংগীতসম্রাট তানসেনের পর দিল্লীর দরবারে এরূপ সম্মান অপর কেহই পান নাই। অতঃপর গায়ক গোলাব খাঁ-এর সঙ্গে নিয়ামত খাঁকে আর বীণা সঙ্গত করিতে হইত না। পরন্তু বাদশাহের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা উত্তরোত্তর এত গভীর হইল যে বাদশাহ নিয়ামত খাঁকে সখারূপে গ্রহণ করিয়া শাহ উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং

নিজ সিংহাসনের পার্শ্বেই তাঁহার আসন দান করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নিয়ামত খাঁ খেয়াল গানের প্রচারে অসাফল্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন এবং বাদশাহের অনুগ্রহ ভিন্ন এই সংগীতের প্রচার সম্ভব নহে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং "সদারঙ্গ" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া গানের ভিতর নিজ নামের সঙ্গে বাদশাহের নাম জুড়িয়া দিয়া বহু খেয়াল গান রচনা করেন। তাঁহার সেই সকল গান অচিরেই দেশময় প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তানসেনের বংশধর নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ) কদাপি নিজ বংশে তাঁহার রচিত কওয়াল গানের শিক্ষা দান করেন নাই ; নিজ বংশের ঐতিহ্য নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালের উল্লেখযোগ্য খেয়াল গায়কগণ পুর্বোক্ত ভিক্ষুক সংগীতজ্ঞদিগের বংশধর অথবা তাঁহাদেরই শিষ্য। সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালীয়া আহাম্মদ খাঁ তাঁহাদেরই বংশধর ; কওয়ালী-রীতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা এই বংশেই পাই। প্রসিদ্ধ খেয়ালী তানরাজ খাঁ, হদ্দু খাঁ, হস্সু ও নত্থু খাঁ প্রভৃতি সকলেই এই ভিক্ষুক বংশেরই শিষ্য।

শাহ সদারঙ্গ খেয়াল গাহিতেন না। ধ্রুপদ ও হোরি গাহিতেন এবং বীণায় ধ্রুপদের আলাপ বাজাইতেন। উক্ত ভিক্ষুক বালকদ্বয়কে তিনি বাদশাহের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) ও ভূপৎ খাঁ (মহারঙ্গ) নামে সদারঙ্গের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদিগকে তিনি ধ্রুপদ ও বীণা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সদারঙ্গ রচিত কোন কোন গানে তাঁহার পুত্র অদারঙ্গের নাম পাওয়া যায়। সদারঙ্গ অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজে যাহা পাইতেন তাহা মুক্তহস্তে গরীব দুঃখীকে দান করিয়া দিতেন ও স্বয়ং ফকীরের জীবন যাপন করিতেন। খেয়াল সংগীতে সদারঙ্গের নাম চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে এবং খেয়ালগায়কগণ কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল তাঁহার অবদান স্মরণ করিবে।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)—অষ্টাদশ শতাব্দী

রামনিধির পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। হুগলী জিলায় ত্রিবেণীর নিকটে চাপতা গ্রামে ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃঃ) রামনিধির জন্ম হয়। তাঁহাদের আদিবাস ছিল কুমারটুলীতে। শৈশবে রামনিধি চাপতা গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। পরে তাঁহার পিতা পুনঃ কুমারটুলীতে আসিয়া বসবাস করিতে থাকাকালে রামনিধি একজন ইংরেজ পাত্রীর নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ২২ বৎসর বয়সে সুখচর গ্রামে ইহার বিবাহ হয়। অতঃপর প্রতিবেশী দেওয়ান রামতনু পালিতের চেষ্টায় ছাপড়া জিলা কালেক্টরীতে তিনি কেরানী পদ প্রাপ্ত হন। রামনিধি আশৈশব অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন এবং ভাল গাহিতে পারিতেন। ছাপড়ায় অবস্থান কালে কোনও মুসলমান ওস্তাদের নিকট শোরীমিঞার টপ্পা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল শিক্ষার পর রামনিধির প্রতিভাদর্শনে শিষ্য গুরুকে কখন অতিক্রম করিয়া যাইবে এই ভয়ে ওস্তাদ তাঁহাকে নূতন গান শিক্ষা দানে পশ্চাৎ পদ হইতে থাকেন। ইহা রামনিধির দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সংগীত শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেই বাংলা টপ্পা রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিলেন। রামনিধি সেই গানে হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী ও তাল, লয় সন্নিবেশ করিয়া এক অভিনব শ্রেণীর সংগীত রচনা করিলেন। সেই নূতন ধরণের সংগীত অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং সকলকেই আকৃষ্ট করিল। বিখ্যাত সংগীতগুণী রসুল বক্স রামনিধি রচিত টপ্পা শুনিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে তিনি এই গান শোরী মিঞার টপ্পা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন বাংলা-দেশে নিধুবাবু রচিত টপ্পার তুলনা নাই, তাঁর গানে সুর ও লয়ের উচ্চাঙ্গের সমাবেশ ঘটয়াছিল এবং তাঁর গান শোরী মিঞারই গান বলিয়া ভ্রম জন্মে। রামনিধির এই মনোমুগ্ধকর অভিনব সংগীত

রচনার পর হইতেই জনসাধারণের নিকট তিনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার রচিত গান নিধুবাবুর টপ্পা নামে অভিহিত হয়। ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খৃঃ) চৈত্র মাসে ৮৮ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দাশরথি রায়—উনবিংশ শতাব্দী

বাংলার সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালী গীতিকার দাশরথি রায় (দাশু রায়) বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকটবর্ত্তী বাঁধমুড়া গ্রামে ইংরাজী ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি তদীয় মাতুলালয় পীলাগ্রামে আসিয়া সামান্য বাংলা ও ইংরাজী লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অতঃপর অক্ষয়া পাটনী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের কবির দলে তিনি গানের বাঁধনদার রূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। এই কারণে তাঁহার মাতুল ও পিতা ক্ষুব্ধ হইয়া দাশরথিকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। তাহাতে দাশরথি অক্ষয়ার দল পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় বন্ধুকে লইয়া নিজেই একটি পাঁচালীর দল গঠন করেন এবং নিজেই গান ও ছড়া বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করেন। এই বার দাশরথির কবি-প্রতিভা বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইল। অত্যল্পকাল মধ্যেই দাশরথির যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তৎকালে আবালবৃদ্ধবনিতা দাশরথির পাঁচালী শুনিয়া মুগ্ধ হইত। দাশরথি গান গাহিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পীলাগ্রামেই পাকা বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক হইতে দাশরথির গানের অজস্র প্রশংসাবাদ উঠিল এবং সমাজে তিনি অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তিনি অন্যূন ৬০টি পালা রচনা করেন। ১২৬৪ (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) তাহার লোকান্তর ঘটে। বাংলার শ্রেষ্ঠ পাঁচালী-রচয়িতা হিসাবে দাশরথি রায়কে বাংলাদেশ চিরকাল স্মরণ রাখিবে।

যদুভট্ট—উনবিংশ শতাব্দী

যদুনাথ ভট্টাচার্য্য অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য্য একজন উৎকৃষ্ট বীণা বাদক, উচ্চস্তরের কণ্ঠ সংগীতশিল্পী ও মার্গ সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধ ছিলেন। পিতার নিকট যদুনাথ সেতার ও মৃদঙ্গবাদন শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিং দিল্লী হইতে তানসেন বংশীয় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও মৃদঙ্গী পীরবক্সকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিষ্ণুপুরের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অনুরোধে বাহাদুর খাঁ কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বাহাদুর খাঁ'র শিষ্যদিগের মধ্যে গদাধর চক্রবর্ত্তী ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং রামশঙ্কর বিষ্ণুপুরের রাজদরবারের সভা গায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অমৃতলাল ও যদুভট্ট বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যদুনাথের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সহিত সেকালের কোনও গায়কের কণ্ঠস্বর তুলনীয় ছিল না বলিয়া যদুনাথ কণ্ঠ সঙ্গীতের সাধনায়ই মনোযোগী হন এবং পরবর্ত্তীকালে যদুভট্ট নামে পরিচিত হন।

প্রথম যৌবনে যদুভট্ট রামশঙ্করের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন; অতঃপর রামশঙ্করের মৃত্যু হইলে যদুভট্ট গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদ শিক্ষা আরম্ভ করেন ও সঙ্গীত বিদ্যায় অধিকতর উৎকর্ষ লাভের জন্য কাশী, দিল্লী, গোয়ালিয়র, জয়পুর ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন। তার ফলে তাঁহার সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। যদুভট্ট কেবল গুরুর নিকট শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই; নানা ঘরোয়ানা এবং নানা ঢংয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নিজস্ব একটি ধারা ও গায়কীর প্রচলন করেন যাহা শ্রোতামাত্রকেই অভিভূত করিত। এই কারণে সারা বাংলা এবং বাংলার বাহিরেও তাঁহার যশ ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল। ২২ বৎসর বয়সে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সঙ্গীত রচনায় মনঃসংযোগ করেন। বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার রচিত হিন্দী ধ্রুপদ গান রচনা নৈপুণ্যে বিখ্যাত হিন্দুস্থানী রচয়িতাদিগের গীত-রচনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। যদুভট্ট যখন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন পঞ্চকোটের রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "রঙ্গনাথ" উপাধি দান করেন।

এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে যদুভট্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে যাইয়া মহর্ষিকে গান শোনান। তাঁহার সংগীতে মুগ্ধ হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায় ঠাকুর বাড়ীর মাধ্যমেই যদুভট্ট ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত পরিচিত হন এবং ত্রিপুরায় যান। সেখানে তাঁহার গান শুনিয়া ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর তাঁহাকে "তানরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময় তানসেন বংশীয় বিখ্যাত রবাবী কাশীম আলি খাঁ ত্রিপুরা রাজদরবারের রবাব বাদক ছিলেন। তিনি যাহা বাজাইতেন যদুভট্ট তাহা শোনা মাত্র আয়ত্ত করিতেন। এই কারণে কাশীম আলি খাঁ ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ত্রিপুরার মহারাজা বিশেষভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদুভট্ট স্থায়ীভাবে ত্রিপুরা রাজদরবারে থাকিতে অস্বীকৃত হন।

গৃহশিক্ষক রূপে ঠাকুর বাড়ীতে থাকা কালে যদুভট্ট রবীন্দ্রনাথকে মার্গ সঙ্গীতে শিক্ষা দান করেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ যদুভট্টের রচিত খাণ্ডারবাণী ও অন্যান্য ধ্রুপদের সুর ও ছন্দ নিয়া বাংলা গান রচনা করেন। ঐ সময় যদুভট্ট কয়েকটি বাংলা ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি বেশীর ভাগ সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজকে গান শুনাইয়া আসিতেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

বিবাহ করেন ; তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। যদুভট্ট মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য ও ঠাকুর বাড়ীর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ গায়কই ছিলেন তাহা নহে, তিনি হিন্দী ও বাংলা ভাষায় অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক গান স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় সঙ্গীত-মঞ্জরী গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যদুভট্ট ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সময় রামপুর ও গোয়ালিয়র রাজ্যে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্যসাধারণ প্রতিভার গুণে যদুভট্ট সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন, যাহা তৎকালে কোনও বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। তাঁহার প্রতিভারশ্মি ভারতীয় সঙ্গীতের উপর গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে তিনি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েক মাস রোগশয্যায় থাকিয়া মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যদুভট্টের দান-অমর কীর্ত্তিরূপে চিরদিন বাঙালীর গৌরবের বস্তু হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—উনবিংশ শতাব্দী

১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺নীলকমল ঘোষ। শৈশবে পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া তিনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ও অতঃপর হেয়ার স্কুলে পড়াশুনা করেন। মাত্র ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যু ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া চার বৎসর কাল নিজ বাটীতে থাকিয়া তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করেন। এই সময়ই কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিয়া তিনি একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন এবং "সধবার একাদশী" পালাটি মঞ্চস্থ করিয়া স্বয়ং

নিমাইচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই সময় হইতেই তাঁহার অভিনেতৃ-জীবনের সূত্রপাত হয়। ঐ সখের থিয়েটারই পরে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তাহাতে টিকিট বিক্রীর প্রচলন সুরু হয়। ইহা গিরিশচন্দ্রের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐ থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করেন। অতঃপর বিডন ষ্ট্রীটে গ্রেট্ ন্যাশনাল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা রূপে যোগদান করেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ থিয়েটারে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময়ই তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কখনো কখনো কর্ত্তৃত্বভার নিয়া, কখনও ডিরেকটার রূপে, বিভিন্ন থিয়েটারে কার্য্য করেন; তন্মধ্যে ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক প্রভৃতি থিয়েটারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই সময় মধ্যে তাঁহার লিখিত বিভিন্ন নাটক বাংলার নাট্যজগতে যুগান্তর স্থষ্টি করে এবং নাট্যকার ও অভিনেতা হিসাবে তাঁহার যশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। উল্লিখিত মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁহার অনূদিত ম্যাকবেথ্ নাটক ঐ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি নামভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনেতা হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, কাল্পনিক ও ধর্মমূলক অন্যূন ৭০ খানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন লিখেন। তন্মধ্যে "বিল্বমঙ্গল", "প্রফুল্ল", "গৃহলক্ষ্মী" প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটকাদি লেখার সময় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা তন্নিযুক্ত লেখক লিখিয়া লইতেন এবং পরে সংশোধিত হইয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের তিনি নাট্যরূপ দান করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করেন। এই ভাবে তিনি নাট্যসাহিত্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন ও রঙ্গমঞ্চে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া নাট্য

জগতের উপর নূতন আলোকসম্পাত করেন। "গৃহলক্ষী" তাঁহার লিখিত শেষ নাটক। বস্তুতঃ বাংলার নাট্য সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অবদান অতুলনীয়, নাট্যকার রূপে তিনি শীর্ষস্থানীয় এবং অভিনেতা রূপে তাঁহার প্রতিভা ও দক্ষতা অবিস্মরণীয়।

তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরমভক্ত গিরিশচন্দ্রের প্রতি পরমহংস দেবের অপার স্নেহ ও করুণা গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনে পরম সহায়ক হইয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র পরমহংস দেবের একজন শ্রেষ্ঠভক্তে পরিণত হন। তদীয় ভক্ত প্রভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশচন্দ্র লিখিত বিল্বমঙ্গল নাটক দেখিতে আসিয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সমাধিস্থ হন। গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন ভাবের বহু গান রচনা করেন। তিনি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও সঙ্গীতে তাঁহার মোটামুটি অধিকার ছিল। গিরিশচন্দ্রের প্রেরণাই রঙ্গালয়ের নাট্যসঙ্গীতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। তাঁহার রচনাতে হাল্‌কা রসের গান যেমন আছে গভীর ভক্তি-মূলক গানেরও অভাব নাই। তাঁহার অনেক গানে তিনি স্বয়ংই সুর দিতেন তদ্ভিন্ন তাঁর বহু গানে যাঁহারা সুর দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দেবকণ্ঠ বাগচি, অমৃতলাল দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের গান শুধু নাট্যসংগীত রূপেই যে জনপ্রিয় হইয়াছিল এমত নহে, পরন্তু সংগীতের আসরেও গিরিশচন্দ্রের গান অনেকেই গাহিতেন। তাঁহার গান অদ্যাপি বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সহিত গীত হইয়া থাকে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। বাংলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের নাম চিরদিন গৌরবোজ্জ্বল থাকিবে।

———

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে—উনবিংশ শতাব্দী

আজ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক একশত বৎসর পূর্বে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১০-ই আগষ্ট তারিখে জন্মাষ্টমী দিবসে বোম্বে প্রদেশের বালকেশ্বর গ্রামে এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণের জন্ম হয়। শৈশবেই মাতার নিকট তিনি ভজন গান শিক্ষা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রুতিধর বালক একটি বার মাত্র শুনিয়াই যে কোন গানের পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার মধ্যে এই অসাধারণ শক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতামাতা পুত্রের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেন।

ঘটনাস্রোতও এই ভাবেই বহিতে থাকে। বিদ্যাশিক্ষা ও সঙ্গীতশিক্ষা উভয় বিষয়েই বিষ্ণুনারায়ণের ছিল সমান অনুরাগ। সুতরাং লেখাপড়া ও সঙ্গীত পাশাপাশি চলিতে লাগিল। তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া উচ্চপ্রশংসা অর্জন করেন এবং বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর কলেজে পড়ার সময় তিনি নিয়মিত ভাবে সংগীত চর্চা করিতে থাকেন। কাশীর বিখ্যাত সেতারী পান্নালাল বাজপেয়ীর সুযোগ্য শিষ্য বল্লভদাসের নিকট তিনি সেতার শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র তিন বৎসর কালের মধ্যেই নিপুণ সেতারবাদক হইয়া উঠেন। এই সময়ে তিনি বিশেষ ভাবে সংগীতশাস্ত্রেরও চর্চা করেন।

এল, এল, বি পাশ করার পর আইন ব্যবসায় উপলক্ষ্যে তিনি করাচীতে যান কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই বোম্বেতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আইনজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সংগীতচর্চা তখন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বোম্বেতে গিয়াই তিনি "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলী" নামক এক সংগীত সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তারই মাধ্যমে বিশিষ্ট ওস্তাদগণের সংস্পর্শে আসিয়া সংগীত শিক্ষায় নিযুক্ত হন।

উক্ত "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলীতে" তিনি প্রায়ই সংগীত সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দিতেন যাহাতে বোম্বে সহরের বিদগ্ধ সমাজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন বোম্বেতে সংগীতের বহুল প্রচারই ছিল তাঁহার লক্ষ্য বস্তু। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সংগীতের জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সংগীত চর্চার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইবার কারণ ঘটে। সংগীতজগৎ যেন চতুর্দ্দিক হইতে হাতছানি দিয়া তাঁহাকে আকুল আহ্বান জানাইতে থাকে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া সংগীতের এই পূজারী তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক যাত্রা সুরু করেন এবং প্রথমেই পর্য্যটন ব্যপদেশে দক্ষিণ ভারতে গিয়া উপস্থিত হন এবং পর পর মাদ্রাজ মহীশূর, তাঞ্জোর,ত্রিবাঙ্কুর ও অপরাপর সংগীত-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া কর্ণাটী সংগীতের বিশিষ্ট গুণীজ্ঞানীদিগের সহিত মিলিত হন। ঐ সময়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতজ্ঞদিগের সংগীত অভিনিবেশ সহকারে শোনেন ও তথাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যাইয়া প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ ও তথ্য সংগ্রহের কার্য্যে ব্যাপৃত হন। কর্ণাটী সংগীত সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা করার সময় তিনি পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখীর ৭২ ঠাট সম্বন্ধে অবগত হইয়া এক নূতন আলোকের সন্ধান পান; এবং তাহার ফলে তৎকালে প্রচলিত রাগরাগিণী-পদ্ধতি পরিহার পূর্বক ঠাট-পদ্ধতি গ্রহণ করেন। উপরোক্ত ৭২টী ঠাট হইতে নিম্নোক্ত ১০টী ঠাট গ্রহণ করিয়া হিন্দুস্থানী সংগীতের যাবতীয় রাগের উৎসরূপে এই ১০টী ঠাটের প্রচলন করেন। ১০টী ঠাট এই—বিলাবল, কল্যাণ, খাম্বাজ, ভৈরব, পূর্বী, মারোয়া, কাফী, আশাবরী, ভৈরবী ও তোড়ী।

অতঃপর তিনি উত্তর ও পূর্ব ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন এবং দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মথুরা, বেনারস, গয়া, জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া শ্রেষ্ঠ ওস্তাদগণের সংস্পর্শে আসেন। তৎকালে তিনি প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া জাকিরুদ্দীনের শিষ্যই

গ্রহণ পূর্ব্বক বহু ধ্রুপদ শিক্ষা করেন এবং আসেথ আলি ও মহম্মদ আলির নিকট তিনশতাধিক খেয়াল গান শিক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু ওস্তাদের নিকট গাণ্ডা বাঁধিয়া তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। এই পর্য্যটনকালে সংগীতশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ও ওস্তাদগণের সংগে সংগীতের আলোচনা ক্রমে তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন তৎসমুদয় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, যাহা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে মারাঠি ভাষায় "হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি" নামক গ্রন্থ চারিখণ্ডে প্রকাশ করেন। নানা ভাষায় লিখিত সংগীত শাস্ত্র হইতে তথ্য উদ্ধার করার নিমিত্ত তাঁহাকে সংস্কৃত, হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটী ও বাংলা ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। অবশ্য সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় তিনি পূর্বেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

১৯০৭ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। বাংলাদেশে তৎকালে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনই ছিলেন সংগীতের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। তিনি বহু সংগীত-গুণীজন বেষ্টিত ছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ এই সুযোগে সেই জ্ঞানীগুণীদের সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লন।

উত্তর ভারত পরিভ্রমণ কালে সেখানকার ওস্তাদদের গান শুনিয়া তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে ওস্তাদগণ গানের রাগরাগিণী বা স্বর-প্রয়োগ সম্পর্কে উদাসীন। তিনি তখন এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হন যে সমস্ত রাগরাগিণীকে পূর্বোক্ত বিলাবল প্রভৃতি দশটী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সুশৃঙ্খল করা আবশ্যক। বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া অক্লান্তকর্মী এই মহাপুরুষ সর্বভারতে মার্গসঙ্গীতের প্রসারের যে মহান ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এবার তিনি তাঁহার সংগৃহীত গান ও তথ্যাদিকে আশ্রয় করিয়া সংগীত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি লক্ষণসংগীতম ও

অভিনবরাগমঞ্জুরী নামক দুটি গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার পরই তিনি "চতুর পণ্ডিত" ছদ্মনামে হিন্দীভাষায় লক্ষণগীত রচনায় নিবিষ্ট হন। এই গানগুলিতে রাগের লক্ষণ সম্যকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই লক্ষণগীতগুলি ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁহার নূতন সৃষ্টি ও অমর অবদান।

রাগরাগিণী সম্পর্কে ওস্তাদগণের মতবিরোধ ও তর্কের সমাধানকল্পে ও শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ঘরোয়ানাকে একটি সর্ববাদী সম্মত নিয়মের অধীন করার উদ্দেশ্যে অতঃপর তিনি সঙ্গীতসম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ১৯১৫-১৯১৬ সালে বরোদার মহারাজার আনুকুল্যে বরোদাতে তিনি প্রথম সঙ্গীতসম্মেলন (All India Music Conference) আহ্বান করেন। ১৯১৮ সালে রামপুরের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে দিল্লীতে দ্বিতীয় বার সংগীত সম্মেলন আহ্বান করেন। এই ভাবে পর পর বানারস, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে সংগীত সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সকল সংগীতসম্মেলন উপলক্ষে সংগীত পরিবেশন ও সংগীত বিষয়ে আবশ্যকীয় আলোচনা দ্বারা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিকল্পনা অতি অল্পকাল মধ্যেই ফলপ্রসূ হয় এবং তাঁহার মহান উদ্দেশ্যকে ক্রমেই সফলতা অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়।

তিনি বিভিন্ন রাগের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, তারানা ও লক্ষণগীত প্রভৃতি স্বরলিপি সহ "ক্রমিক পুস্তক মালিকা" ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতজী অতি সহজবোধ্য এক অভিনব স্বরলিপিপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমানে ভাতখণ্ডেজীর আবিষ্কৃত স্বরলিপি পদ্ধতি সর্বভারতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। শ্রুতিধর এই মহাপুরুষ যখন যেখানে যে ওস্তাদের গান শুনিয়াছেন তখনই তাহার স্বরলিপি করিয়াছেন। এবং তাঁহার বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত সংগীতের সেই মধুচক্র

সংগীতপিয়াসী ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে দান করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতজী ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ এই ভারতীয়-সংগীতকে অসূর্য্যম্পশ্য করিয়া রাখিলে চলিবে না। এই সংগীতকে সহজলভা করিতে হইবে—তাইতো হিমালয়ের গুহা-মুখ হইতে ভগীরথ গঙ্গাকে আনিয়া যেমন সারা ভারতের অঙ্গ সেই পুণ্য সলিলে ধৌত করিয়া দিয়াছেন পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণও তেমনি যক্ষসদৃশ তৎকালের রক্ষণশীল ওস্তাদগণের কঠোর প্রহরাবেষ্টিত অন্ধকার গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া সংগীত-নির্ঝরিণীকে ভারত আপামর জনসাধারণের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া নিজেও কৃতার্থ হইলেন এবং সকলকে কৃতার্থ করিলেন। তাই আজ শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার সুযোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়াছে। তাঁহারই চিন্তা প্রসূত পরিকল্পনা অনুসারে লক্ষ্ণৌতে মরিস কলেজে (বর্ত্তমানে ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ) স্থাপিত হয় এবং তদীয় প্রিয় শিষ্য ও দক্ষিণ হস্তরূপ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের হস্তে তার কর্তৃত্বভার দেন। তাঁহারই চেষ্টায় বরোদা এবং গোয়ালিয়রে সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী আজ সারা ভারতে অসংখ্য সংগীত শিক্ষায়তন এমনকি সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিতেছে।

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা মুক্ত হস্তে ভারতকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে সর্বভারতে মার্গ-সংগীতের এই প্রসার তাঁহারই দান—এবং এই কারণেই পণ্ডিতজী চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ১৯৩৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গণেশচতুর্থী তিথিতে এই মহাপুরুষের দেহান্তর হয়।

———

॥ পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর (উনবিংশ শতাব্দী) ॥

১৮৭২ সালে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কুরুন্দবাড় নামক এক দেশীয় রাজ্যে সঙ্গীতাচার্য্য পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের জন্ম হয়। তাঁহারই পিতা শ্রীদিগম্বর হরিকীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেওয়ালী উপলক্ষে আতসবাজী পোড়াইতে গিয়া কিশোর বিষ্ণুদিগম্বরের চক্ষু খারাপ হয় এবং তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে মীরাজে শ্রীবালকৃষ্ণ বুওয়ার নিকট সংগীত শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। সেখানে তিনি সর্বপ্রকার সংগীতে জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তিনি তদীয় সংগীতগুরুর সঙ্গে নানা সংগীতের আসরে উপস্থিত থাকিয়া সংগীত পরিবেশন পদ্ধতি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। সংগীত-শিক্ষার্থী থাকা কালে তিনি সর্বদা গুরুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যা করেন এবং একনিষ্ঠভাবে সংগীতের সাধনা করেন ও সর্বপ্রকার বিলাস বর্জ্জন করিয়া চলেন। ১৮৯৬ সালে পণ্ডিতজী সংগীত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রাম পর্য্যটন এবং তদুপলক্ষে তৎকালীন সঙ্গীতের গায়কীর চরম শোচনীয়তা উপলব্ধি করেন; আর ইহাও লক্ষ্য করেন যে সমাজে সঙ্গীতকে যোগ্য আদর ও সম্মান দেওয়া হইতেছে না। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তাঁহার অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল এবং তিনি সংকল্প করিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত সঙ্গীত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও গুণিগণ মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত না হইতেছে ততদিন তিনি বিন্দুমাত্র বিশ্রাম করিবেন না। তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন করার নিমিত্ত সঙ্গীতে শৃঙ্গার রসের ভাষা বর্জন করিয়া ভক্তিরসাশ্রিত বাণী সহযোগে গীত-রচনাপূর্বক সঙ্গীত প্রচারে ব্রতী হন। ইহার ফলে সমাজে তাঁহার ভক্তিমূলক সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট আমন্ত্রণ আসিতে থাকে। এই প্রকারে কীর্ত্তন ও ভজন গানের প্রচার ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি স্বীয় চরিত্র ও সদগুণাবলীর নিমিত্ত লাহোরের

বিশিষ্ট নাগরিকগণমধ্যে নিজের স্থান করিয়া লন এবং ১৯০১ সালে তথায় গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় নামে একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁহার জীবনের অর্জিত সমুদয় অর্থ তিনি ঐ মহাবিদ্যালয়ে দান করেন। কিন্তু অর্থাভাবহেতু প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুচারু রূপে চলিতে পারে নাই। এই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তৎসত্ত্বেও তিনি নিরাশ হন নাই এবং সব সময় উক্ত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের কাজেই নিযুক্ত থাকিতেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা খারাপই ছিল কিন্তু স্থানীয় বিচারক শ্রীচ্যাটার্জীর আনুকূল্যে শীঘ্রই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে প্রতিষ্ঠানটি শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে এবং সারা পাঞ্জাবে সঙ্গীতের প্রচার উত্তম রূপেই হয়। ১৯০৮ সালে পণ্ডিতজী বোম্বাই সহরে আসেন ও তথায় গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন করেন। কিছুদিন মধ্যেই সেই প্রতিষ্ঠানটি লাহোরের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় পৌঁছে। সেই সময় পণ্ডিতজী কোনও বন্ধুর নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু বন্ধুর ঋণ যথা সময়ে পরিশোধ করিতে না পারায় বাড়ীটি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি রামায়ণ গান করিয়া একটি ছোট বাড়ী তৈয়ারী করেন এবং ঐ বাটীর সংলগ্ন ভূমিতে একটি রামায়ণ মন্দিরও স্থাপন করেন। সেই সময় পণ্ডিতজী "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম" এই রামধুনটি স্বয়ং গান করিয়া জনগণ মধ্যে বিশেষভাবে ইহার প্রচার করেন। উক্ত রামায়ণমন্দিরে তদীয় শিষ্যগণ অদ্যাপি ভগবদ্বিষয়ক ভজনগান করিয়া থাকেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে ভারতবিখ্যাত গায়ক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্দ্ধন, বি, আর, দেওধর, বামনরাও উপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সঙ্গীত বিষয়ে আনুমানিক ৫০ খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট মীরাজ নগরে তাঁহার দেহান্তর ঘটে।

পণ্ডিতজীর সুযোগ্য পুত্র ভারতবিখ্যাত গায়ক ডি, ভি, পলুস্কর বোম্বাইস্থিত গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় সঙ্গীতের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পূর্বে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ইনায়েত খাঁ—উনবিংশ শতাব্দী

১৮৮৫ ইং সালে এটোয়া নামক স্থানে ইনায়েত খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুরবাহার ও সেতার যন্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন। ইহার পিতামহ দাদ খাঁ ধ্রুপদ, খেয়াল ও গজলের একজন বিশেষজ্ঞ এবং জলতরঙ্গ ও সারেঙ্গী বাদ্যে বিশারদ ছিলেন। ইনায়েত খাঁ'র পিতা ইমদাদ খাঁ হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ সুরবাহার ও সেতার বাদক ছিলেন। জোড় গৎ ও তোড়া প্রভৃতিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। তিনি নওগাঁও ও বানারসের মহারাজার দরবারের বাদক ছিলেন। অতঃপর কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাবাদক হন ও পরে তিনি অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে নিযুক্ত হন। পরিশেষে নিজের দুই পুত্র সহ ইন্দোরে বসবাস করিতে থাকেন ও মহারাজার দরবারে নিযুক্ত হন। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। দুই পুত্রমধ্যে বড় বহীদ খাঁ ও ছোট ইনায়েত খাঁ। ইনায়েত খাঁ শিশুকাল হইতে আপন পিতার নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরী প্রভৃতিতে তালিম প্রাপ্ত হন। অতঃপর পিতার নিকটই সুরবাহার ও সেতার বাদ্যের শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বীয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কলাকারে পরিণত হন। তিনি পর পর কাথিয়াবাড়, মহীশূর, বরোদা ও ইন্দোরা প্রভৃতি স্থানে সংগীত প্রসার ব্যপদেশে ছিলেন—তাহার পর তিনি কিছুকাল

গৌরীপুরের (ময়মনসিংহ) স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সভাবাদক ছিলেন। অতঃপর তিনি নানা স্থানে বহু সংগীত সম্মেলনে যোগদান করিয়া বহু স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সারা ময়মনসিংহ জিলাতে তাঁহার বহু শিষ্য বর্ত্তমান। ১৯৩৯ ইং সালে তাঁহার দেহান্তর হয়। তাঁহার পুত্র বিলায়েত খাঁ ও ইম্‌রাৎ খাঁ এই দুইজন বর্ত্তমানে সুদক্ষ সেতারী। ইনি গৌরীপুরের ঘরোয়ানাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

———

অতুলপ্রসাদ সেন—উনবিংশ শতাব্দী

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর ঢাকা সহরে (অধুনা বাংলাদেশ) অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা খ্যাতনামা চিকিৎসক রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদ সেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অতুলপ্রসাদ সেনের মাতামহের নাম কালীনারায়ণ গুপ্তা। ১৩ বৎসর বয়সে অতুলপ্রসাদ পিতৃহারা হইলে মাতামহের গৃহে লালিত পালিত হন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষার পর তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান। ইংলণ্ডে থাকাকালীন তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও চিত্রকলা বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলায় তাঁহার পশার জমিল না। তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করিলেন উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত লখনউ সহরে এবং সেখানে বিখ্যাত আইনজীবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। লখনউতে তিনি ছিলেন সকলের "অতুলদা"।

সেই সময়ে তিনি শুধু আইনজীবীই ছিলেন না, রাজনীতিতেও যোগদান করেন। তিনি তৎকালীন নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের মতকেই অনুসরণ করিতেন।

অতুলপ্রসাদ সমাজসেবী ছিলেন। তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ জনকল্যাণের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই জনকল্যাণমূলক কাজের সহকর্ম্মী ছিলেন, কানপুরের ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন।

অতুলপ্রসাদ সুসাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" এবং "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে"র সভাপতি ছিলেন।

অতুলপ্রসাদ ব্রাহ্ম সন্তান হইলেও ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি চিরকালই নিরপেক্ষ ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকের কাছেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। লখনউতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সঙ্গে তিনি আমরণ জড়িত ছিলেন। মিশনের তৎকালীন মহারাজ স্বামী দেবেশানন্দজীর সাথে তাঁহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা ছিল। জনহিতকর কার্য্যে মিশনের মাধ্যমে যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ হইত, তাহার জন্য তিনি প্রচুর ঔষধ মিশনকে দান করিতেন। প্রতি রবিবার নিয়মিত তিনি মিশনে যাইতেন। তাঁহার ব্যবহার অতি অমায়িক ছিল। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন সকলেই তাঁহার মানবতায় অভিভূত হইয়াছেন।

তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে আইনজ্ঞ, সমাজ সেবক, রাজনীতিবিদ, সুসাহিত্যিক, কবি, গীতিকার ও সুরকার।

তাঁহার গানগুলি "গীতিগুঞ্জ", "কাকলি" ও "কয়েকটি গান" —এই তিনটী বইতে লিপিবদ্ধ আছে। অতুলপ্রসাদের গীত সংখ্যা তিন শতের অধিক নহে। তাঁহার রচনাগুলি স্বল্প সংখ্যক হইলেও মূল্যের দিক দিয়া অমূল্য। সঙ্গীতকে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। অবসর বিনোদন ও আন্তরিক প্রেরণাবশেই সঙ্গীত রচনা করিতেন।

অতুলপ্রসাদ বিভিন্ন ও বিচিত্র রস ও রূপের সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। যেমন—স্বদেশী গান, ধ্রুপদ, রাগপ্রধান, বাউল, কীর্ত্তন, গজল, কাজরী, লগনী, সাওয়ানী, পিলু বাঁরোয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

পূর্বতন মরিস কলেজ, অধুনা ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠের সুপরিচিত অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকরজীর নিকট অতুলপ্রসাদ বহুকাল শিক্ষালাভ করেন, উপরন্তু ঐ মহাবিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রী জি, এন, নাটু মহাশয় অতুলপ্রসাদের গৃহশিক্ষকরূপে বহুদিন ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীঃ হইতে ১৯৩৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত লখনউ থাকাকালীন আমি অতুলপ্রসাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম এবং অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলাম। সপ্তাহে তিন চারবার আমি তাঁহার গৃহে যাইতাম ও তাঁহার রচিত বহু গান তিনি নিজে আমাকে শিক্ষাদান করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের অপেক্ষা দশ বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কবিগুরুর প্রভাব তাঁহার উপর যথেষ্টই ছিল। অতুলপ্রসাদ কবিগুরুর খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন। বিশ্বকবি অতুলপ্রসাদকে তাঁহার গানের স্বরলিপিগুলি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "পরিবেশ" নামক কাব্যগ্রন্থটী অতুলপ্রসাদকে উৎসর্গ করিয়া একটি "সনেট" উপহার দিয়াছিলেন।

অতুলপ্রসাদের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার সুর ও ভাবের একান্ত নিজস্ব স্বকীয় সত্তা। উচ্চাঙ্গসংগীত ও লোকসঙ্গীত, এই দুই ধারার সঙ্গে যুক্ত রাখিয়া, গান ও সুর রচনাই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। এই কারণে সবশ্রেণীর শ্রোতারা তাঁহার গানে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ন্যায় বাংলায় তিনি ভারী ঢঙের গান রচনা করেন। স্বরসামঞ্জস্য, সুর প্রয়োগে ভাবের আবেদনে অতুলপ্রসাদ একটী স্বকীয় শৈলীর সৃষ্টি করেন। অতুলপ্রসাদের গান, সঙ্গীত জগতে, আপনার স্বাতন্ত্র্যে ও স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর

হইয়া থাকিবে চিরকাল। তাই আজও বহু সঙ্গীত স্রষ্টার মধ্যে অতুলপ্রসাদের আসন চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অতুলপ্রসাদের কর্মজীবন বিচিত্র ও বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লখনউতে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাহাতে অতুলপ্রসাদ স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক ছিলেন। ঐতিহাসিক দিক হইতে এই অধিবেশন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কংগ্রেসের দুটী দল যাঁহা ১৯০৭ সালে পৃথক হইয়া গিয়াছিল, এই অধিবেশনে তাহা পুনরায় মিলিত হয়। স্বরাজ্য যোজনাও এই অধিবেশনেই তৈয়ারী হয় যাহা লখনউ এক্ট নামে সুপরিচিত। নিরপেক্ষবাদী অতুলপ্রসাদ এই ব্যাপারে অভিভূত হইয়া আনন্দের প্রেরণায় এই মিলন উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীতটি সৃষ্টি করেন।

"দেখ্ মা এবার দুয়ার খুলে
গলে গলে এনু মা,
তোর হিন্দু মুসলমান দুই ছেলে।"

ইহা ব্যতীত তিনি আরো স্বদেশী গান রচনা করিয়াছেন যেমন, "হও ধরমেতে ধীর", "মোদের গরব মোদের আশা", "উঠগো ভারত লক্ষ্মী" ইত্যাদি—

অতুলপ্রসাদের অন্যতম কীর্ত্তি হইল, রাগপ্রধান গানের সৃষ্টি। ইতিপূর্ব্বে এরকম গানের চলন ছিলনা। আধুনিক গানকে তিনি রাগের মাধ্যমে, শাস্ত্রীয় কলাকৌশলাদি প্রয়োগ করিয়া, "রাগ-"প্রধান" গানের সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রণে আধুনিক গান, ইতিপূর্ব্বে কখনও গাওয়া হইত না। এই মিলনকে কেন্দ্র করিয়া জন্ম নিল একটী স্বতন্ত্র গীতধারা, যাহা এখন জনসমাজে "রাগপ্রধান" নামে পরিচিত। "রাগপ্রধান" এই নামটীও অতুল প্রসাদের নিজের দেওয়া। তাঁহার রচিত "রাগপ্রধান" গানের মধ্যে, "বধু ধর ধর মালা" গানটী কালিংড়া রাগে, "তবু তোমায় ডাকি

বারে বারে" গানটি সিন্ধুকাফী রাগে, এবং "ডাকে কোয়েলা বারে বারে," গানটি গৌড়মল্লার রাগের উপর রচিত। অতুলপ্রসাদের সৃষ্ট গানের গভীর আকুতি ও অন্তহীন ব্যাকুলতা সকল মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন বিরহবেদনায় অতল স্পর্শ সমুদ্রের অশ্রুর ঢেউ তোলে, সেজন্য তাহার রচনাগুলি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের কাছেই আদরণীয়। এই গুলিই তাঁহার গীত রচনার বৈশিষ্ট্য। খম্বাজ রাগের প্রভাব তাঁহার গানে খুব বেশী দেখা যায়। তাঁহার বেশীর ভাগ গানই খম্বাজ রাগের উপর রচিত। যথা, খম্বাজ, মিশ্র খম্বাজ, ঝিঁঝিঁট খম্বাজ ইত্যাদি। ভৈরবীও তাঁহার অতিপ্রিয় রাগ ছিল। ইহা ব্যতীত, তিনি নটমল্লার, নায়কীকানাড়া, কাফী, পিলু-ইত্যাদি রাগের উপরেও গান রচনা করিয়াছেন।

ধ্রুপদাঙ্গের গান তিনি কমই রচনা করিয়াছেন। 'নমঃ বাণী বীণাপানী" এই গানটি ইমন কল্যাণ রাগে রচিত খাঁটি ধ্রুপদাঙ্গের গান। ধ্রুপদের সঙ্গে কীর্ত্তনের মিশ্রণে তাঁহার আরেকটি অদ্ভূত সৃষ্টি। ধ্রুপদ ও কীর্ত্তনের মিশ্রণে একট অপূর্ব্ব গীতি মাধুর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বাংলা সঙ্গীতে খুব কমই পাওয়া যায়। যথা "জানি জানি হে রঙ্গরাণী" গানটি "তিলক কামোদ" রাগের উপর রচিত। গানটি ধ্রুপদের চালেই গাওয়া চলিত, কিন্তু সঞ্চারী কীর্ত্তনের ঢঙে গাওয়ার জন্য গানটি গাহিবার শৈলীই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

তিনি ঠুংরী, টপ্পা ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন। অতুলপ্রসাদ বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ টপ্পা রচনা করিয়াছেন খম্বাজ রাগে। "কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা", 'কে যেন আমারে বারে বারে চায়" প্রভৃতি গানগুলি টপ্পার সুললিত কারুণ্যে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। টপ্পা গানগুলি তাঁহার গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচিত গজল "কত গান ত হল গাওয়া" গানটি সর্ব্বজন পরিচিত। 'ঝরিছে ঝর ঝর", সাওয়ানী, "মোর আজি গাঁথা হল না মালা" পিলু বাঁরোয়া, ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন।

বাংলার লোকগীতি তাঁহাকে খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাউল গান তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল। "আর কতকাল রইব বসে" ও কীর্ত্তনে "ওগো সাথী মম সাথী", গানগুলির মধ্যে লোকসঙ্গীতের যে অপরূপ স্বরের স্পর্শ আছে, যাহা শোনামাত্র প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠে।

তাঁহার পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল না। কিন্তু তাঁহার জন-প্রিয়তা ছিল অসাধারণ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট, তাঁহার দেহবসান হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে তাঁহার শবাধার বহন করিয়াছিল। লখ্‌নউ চারবাগে, এ. পি. সেন রাজপথে অদ্যাবধি তাঁহার বসতবাটী বর্ত্তমান আছে।

অতুলপ্রসাদ রচিত বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি গানের তালিকা দেওয়া হইল—

স্বদেশী গান

১। "উঠগো ভারত লক্ষ্মী"

২। "বল বল বল সবে"

ধ্রুপদ

১। "নমঃ বাণী বীণাপানী" (ইমনকল্যাণ)

২। "ক্ষমিও হে শিব" (জয়শ্রী)

কীর্ত্তন

১। কেন এলে ভবে মানবের ভবে—

২। ওহে পুরজন দাও কিছু ধন—

রাগপ্রধান

১। যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে—(নটমল্লার)

২। হরি, তোমারে পাব কেমনে (সুরট মল্লার)

বারে বারে" গানটি সিন্ধুকাফী রাগে, এবং "ডাকে কোয়েলা বারে বারে," গানটি গৌড়মল্লার রাগের উপর রচিত। অতুলপ্রসাদের সৃষ্ট গানের গভীর আকুতি ও অন্তহীন ব্যাকুলতা সকল মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন বিরহবেদনায় অতল স্পর্শ সমুদ্রের অশ্রুর ঢেউ তোলে, সেজন্য তাহার রচনাগুলি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের কাছেই আদরণীয়। এই গুলিই তাঁহার গীত রচনার বৈশিষ্ট্য। খম্বাজ রাগের প্রভাব তাঁহার গানে খুব বেশী দেখা যায়। তাঁহার বেশীর ভাগ গানই খম্বাজ রাগের উপর রচিত। যথা, খম্বাজ, মিশ্র খম্বাজ, ঝিঁঝিঁট খম্বাজ ইত্যাদি। ভৈরবীও তাঁহার অতিপ্রিয় রাগ ছিল। ইহা ব্যতীত, তিনি নটমল্লার, নায়কীকানাড়া, কাফী, পিলু-ইত্যাদি রাগের উপরেও গান রচনা করিয়াছেন।

ধ্রুপদাঙ্গের গান তিনি কমই রচনা করিয়াছেন। 'নমঃ বাণী বীণাপানী" এই গানটি ইমন কল্যাণ রাগে রচিত খাঁটি ধ্রুপদাঙ্গের গান। ধ্রুপদের সঙ্গে কীর্ত্তনের মিশ্রণে তাঁহার আরেকটি অদ্ভুত সৃষ্টি। ধ্রুপদ ও কীর্ত্তনের মিশ্রণে একটি অপূর্ব্ব গীতি মাধুর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বাংলা সঙ্গীতে খুব কমই পাওয়া যায়। যথা "জানি জানি হে রঙ্গরাণী" গানটি "তিলক কামোদ" রাগের উপর রচিত। গানটি ধ্রুপদের চালেই গাওয়া চলিত, কিন্তু সঞ্চারী কীর্ত্তনের ঢঙে গাওয়ার জন্য গানটি গাহিবার শৈলীই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

তিনি ঠুংরী, টপ্পা ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন। অতুলপ্রসাদ বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ টপ্পা রচনা করিয়াছেন খম্বাজ রাগে। "কাঙাল বলিয়া করিও না হেলা", 'কে যেন আমারে বারে বারে চায়" প্রভৃতি গানগুলি টপ্পার সুললিত কারুণ্যে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। টপ্পা গানগুলি তাঁহার গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচিত গজল "কত গান ত হল গাওয়া" গানটি সর্ব্বজন পরিচিত। 'ঝরিছে ঝর ঝর", সাওয়ারী, "মোর আজি গাঁথা হল না মালা" পিলু বাঁরোয়া, ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন।

বাংলার লোকগীতি তাঁহাকে খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাউল গান তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল। "আর কতকাল রইব বসে" ও কীর্ত্তনে "ওগো সাথী মম সাথী", গানগুলির মধ্যে লোকসঙ্গীতের যে অপরূপ সুরের স্পর্শ আছে, যাহা শোনামাত্র প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠে।

তাঁহার পারিবারিক জীবন খুব সুখের ছিল না। কিন্তু তাঁহার জন-প্রিয়তা ছিল অসাধারণ। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে আগষ্ট, তাঁহার দেহবসান হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে তাঁহার শবাধার বহন করিয়াছিল। লখ্‌নউ চারবাগে, এ. পি. সেন রাজপথে অদ্যাবধি তাঁহার বসতবাটী বর্ত্তমান আছে।

অতুলপ্রসাদ রচিত বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি গানের তালিকা দেওয়া হইল—

স্বদেশী গান

১। "উঠগো ভারত লক্ষ্মী"

২। "বল বল বল সবে"

ধ্রুপদ

১। "নমঃ বাণী বীণাপাণী" (ইমনকল্যাণ)

২। "ক্ষমিও হে শিব" (জয়শ্রী)

কীর্ত্তন

১। কেন এলে তবে মানবের ভবে—

২। ওহে পুরজন দাও কিছু ধন—

রাগপ্রধান

১। যাবনা যাবনা যাবনা ঘরে—(নটমল্লার)

২। হরি, তোমারে পাব কেমনে (সুরট মল্লার)

কাজরী

১। জল্ বলে চল্ মোর সাথে চল্—

টপ্পা

১। কাঙাল বলিয়া করিওনা হেলা—
২। কে যেন আমারে বারে বারে চায়—

ভাটিয়ালী

১। কিষাণ ভাই,
তুমি কি ফসল ফলাবে এমন মাঠে —

বাউল

১। বাজিয়ে রবি তোমার বীণে—
২। প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল্—

গজল

১। রাতারাতি করল কেরে ভরা বাগান ফাঁকা-
২। কত গানত হল গাওয়া—

বাঁরোয়া

১। মোরে কে ডাকে, আয়রে বাছা আয়—
২। হৃদে জাগে শুধু বিষাদ রাগিনী—

সাওয়ান

১। শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে
২। ঝরিছে ঝর ঝর, গরজে গর গর

সিন্ধু কাওয়ালী

৩। মন হতে কে পালাল গো—

লাউনী

১। কেন এলে মোর ঘরে
আগে নাহি বলিয়া—

লগ্নী

১। কেগো গাহিলে পথে—

রামপ্রসাদী মাল্‌সী

১। আর দে, দে, বলব না তোরে—

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ আলম (উনবিংশ শতাব্দী)

সঙ্গীত সাধক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। সেজন্য ঠিক কত খ্রীষ্টাব্দের কোন তারিখে তাঁহার জন্ম হইয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ কেহই জানেন না। কেহ বলেন মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ১১০ বৎসর, কেহ বলেন ৯১/৯২ বৎসর কেহ বলেন ৯৮/৯৯ বৎসর। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ হইতে একথা বোঝা যায় যে, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একশতের মত হইয়াছিল, এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

যাহাহউক ওস্তাদের বয়স আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তিনি একজন সংগীতসাধক ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে ওস্তাদের আদিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম সদুখাঁ ও মাতার নাম ছিল সুন্দরী বেগম। সদুখাঁ সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের অর্থশালী ব্যক্তি

ছিলেন। সদুখাঁ ছিলেন সংগীতজ্ঞ ও সেতারী। মিঁয়া তানসেনের বংশধর, ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁর নিকট তিনি সেতার শিক্ষালাভ করেন। পরবর্ত্তীকালে সদুখাঁ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক সহরে (অধুনা বাংলাদেশ) বসতি করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সম্ভ্রান্ত মুসলমান সঙ্গীতশিল্পী পরিবারে জন্ম নিলেন অমর সঙ্গীতসাধক, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। ওস্তাদ ছিলেন সদুখাঁর তৃতীয় পুত্র। ওস্তাদরা পাঁচ ভাই। সদুখাঁর পুর্বপুরুষেরা প্রথম হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন। খাঁ পরিবারের সকলেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ওস্তাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাংলা ঢোল, তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। হারমোনিয়াম সংগ্রহ নামক একপ্রকার যন্ত্র (নিজ আবিষ্কৃত) বাজাইতেন এবং তিনি গানও গাহিতেন। মধ্যমভ্রাতা, যিনি জন-সমাজে "ফকির সাহেব" বলিয়া পরিচিত, তাঁহার নাম ছিল সাহেব আকতাবুদ্দীন খাঁ। ফকিরসাহেব তৎকালীন দুইজন সঙ্গীতগুণীর নিকট বাঁশী, বেহালা ও তবলা শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি একজন হিন্দু সাধুর শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া "কালী" সাধনা করিতেন। ভক্তিমুলক বহুগান তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বাঁশীতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মাতৃসাধনায় বিভোর হইয়া তিনি যখন বাঁশী বাজাইতেন, সেই বাঁশীর সুর শুনিয়া অনেকের পক্ষেই অশ্রুরোধ করা কঠিন হইত।

অন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ একেবারেই নিরপেক্ষ ছিলেন। যদিও তিনি ধর্মভীরু মুসলমান ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মের দৈনন্দিন নিয়ম আচারগুলি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন। কিন্তু সব ধর্মের উপর তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার মাতা ও সহোদরার নামগুলি ছিল, হিন্দুনারীদের প্রচলিত নামে। অনেক গোঁড়া হিন্দু অপেক্ষা, তাঁহার হিন্দুতত্বের জ্ঞান অধিক ছিল। তিনি বহুপূর্বেই "হজ" করিয়া আসিয়াছিলেন।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি পাঁচবার নমাজ পড়িতেন। আবার হিন্দুর মন্দিরেও দর্শন করিতে যাইতেন এবং দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। "রেওয়াজ" করিতে করিতে কোন একটি ঘরে "ন্যাস" করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিবার ক্ষণমুহূর্ত্তে, কখনও "আল্লা", কখনও "রাম" কখনও "যিশুর" নাম জপ করিতে শোনা যাইত। তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল অতি সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তিনি ছিলেন উদারমনোবৃত্তি সম্পন্ন মহান মানুষ। জাত্যাভিমান তাঁহার একেবারেই ছিল না।

শিশুকাল হইতেই তিনি সংগীতানুরাগী ছিলেন। তাঁহাকে সময়মত লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইল ঠিকই কিন্তু সেদিকে তাঁহার মন একেবারেই ছিল না। নিয়মিত তিনি বিদ্যালয়ে যাইতেন না। বিদ্যালয়ের পথে এক শিবমন্দিরে বসিয়া সাধুদের সেতার বাজনা শুনিতেন। বাড়ীতে যখন পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতারা গানবাজনা করিতেন ওস্তাদ সেগুলি মনোযোগ সহকারে শুনিতেন। তিনি অত্যন্ত শ্রুতিধর ছিলেন, অতি সহজেই একবার শুনিয়াই "গৎ" ও "ঠেকা" আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। বিদ্যালয়ে তিনি নিয়মিত যাইতেছেন না এই খবর পাইয়াও, সংগীতজ্ঞ পিতা সদু খাঁ পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু মাতা সুন্দরীবেগম পুত্রকে বেশ কঠিন ভাবে শাসন করিলেন। এই ব্যাপারের পর, আলাউদ্দিন বুঝিতে পারিলেন যে বাড়ীতে থাকিলে তাঁহার সংগীত শিক্ষা হইবে না। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মাতার ক্যাশ বাক্স হইতে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া কিশোর আলাউদ্দীন খাঁ "সুরব্রহ্মের" সন্ধানে গৃহত্যাগ করিলেন।

গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে আলাউদ্দীন খাঁ আসেন ঢাকায়। সাধনা করিতে হইলে গুরু চাই; "উত্তর সাধক" না হইলে সিদ্ধি

লাভ করা সম্ভব হয় না। ঢাকায়, কেহ তাঁহাকে শিখাইতে রাজী হইলেন না। ঢাকা হইতে ইতস্ততঃ কয়েক জায়গায় ঘুরিয়া কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় তাঁহার এমন কোন পরিচিত লোক ছিলেন না, যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি গান বাজনা শিখিতে পারেন। তাই তিনি আশ্রয় লইলেন গঙ্গার ধারের এক ফুটপাতে। খাওয়ার ব্যবস্থা হইল, উত্তর কলিকাতার এক জমিদারের অন্নসত্রে, তবে তাও একবেলা জুটিল, রাত্রে কিন্তু শুধুই গঙ্গাজল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় পাথেয় যাহা আনিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই সব শেষ হইয়া গেল। এমনকি টাকা পয়সা সহ কাপড়ের পুঁটলীটীও একদিন চুরি হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন দুঃখ ছিল না। তাঁহার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান তখন কিরূপে গুরুর সন্ধান পাইবেন এবং কি উপায়ে গান বাজনা শিখিবেন। যাঁহার সাথে দেখা হয় তাঁহাকেই অনুরোধ করেন একজন গুরুর সন্ধান দিতে। তাঁহার এই আবেদন কেহ গ্রাহ্যও করিলেন না। অবশেষে সংগীত শিল্পী "নুলোগোপাল" তাঁহাকে গান শিখাইতে রাজী হইলেন। নুলোগোপালের প্রকৃত নাম গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত খেয়ালী ছিলেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি "নুলো" হইয়া যান ও লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হইয়া লালাবাবু, ওরফে প্রাণকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীর ঈশ্বরী প্রসাদের নিকট কণ্ঠসংগীত শিক্ষার জন্য ঈশ্বরীপ্রসাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোপাল চক্রবর্ত্তী জন-সমাজে "নুলোগোপাল" নামেই পরিচিত। আলাউদ্দীন খাঁ নুলোগোপালের নিকট কণ্ঠসংগীত শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া নুলোগোপাল তাঁহাকে কেবল স্বরগ্রাম অভ্যাস করাইলেন। স্বরগ্রামে প্রায় ৩৫০ শত অলঙ্কার পদ্ধতি তিনি গলায় আয়ত্ত করিলেন। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই চলিল। গুরু লাভ করিয়া ও গুরুর সযত্ন শিক্ষায়, জীবন ধারণের

ন্যূনতম চাহিদাকেও তিনি আমল দিলেন না। এইভাবে সাত বৎসর ধরিয়া তিনি নুলোগোপালের নিকট সংগীত শিক্ষা লাভ করিলেন।

সাত বৎসর পরে আবার বাধার সৃষ্টি হইল। তিনি কলিকাতায় আছেন, দেশের আত্মীয়স্বজনেরা এই খবর পাইয়া কলিকাতায় ফকির সাহেব আসিয়া আলাউদ্দীনকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। উপরন্তু পুনরায় বাড়ী হইতে যাহাতে তিনি পলায়ন না করিতে পারেন সেজন্য তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন লাভই হইল না। সংগীত পিপাসু ওস্তাদকে ঘর, সংসার, লোভ, মোহ কিছুই আকৃষ্ট করিতে পারিল না। বিবাহের রাত্রিতেই নব-পরিণীতা স্ত্রী, ঘর-সংসার সব কিছু ছাড়িয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় সংসার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়ন করিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু তখন আর নুলোগোপালের সাথে তাঁহার দেখা হইল না। খবর পাইলেন, গুরু ইতিমধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে মনে মনে তিনি গভীর আঘাত পাইলেন, স্থির করিলেন, কণ্ঠ সঙ্গীতের চর্চ্চা আর করিবেন না, এবার যন্ত্রসঙ্গীতেরই সাধনা করিবেন। পুনরায় আরম্ভ হইল গুরুর সন্ধান।

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা হাবু দত্ত একজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। খাঁ সাহেবের সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ ও আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। হাবু দত্তের একটি ভাল ঐকতানের দল ছিল। নাট্যকার গিরীশ ঘোষের থিয়েটারের দলে হাবু দত্তের ঐক্যতানের দল বাজনা বাজাইত। আলাউদ্দীন ঐকতানের দলে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। তিনি হাবু দত্তের নিকটে দিনের বেলায় শিক্ষালাভ করিতেন ও "রেওয়াজ" করিতেন। রাত্রে থিয়েটারের দলে, ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাজাইতেন। ঢোল, তবলা ইত্যাদি তাঁহার পূর্বেই আয়ত্ত ছিল।

ঐকতানের দলে থাকার জন্য তাঁহার অনেক উপকার হইল। অনেকগুলি বাজনা তিনি বাজাইতে শিখিলেন যথা, পাখোয়াজ, সানাই, ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট ইত্যাদি। থিয়েটারী গানও তিনি শিখিলেন। ইডেন উদ্যানের ইংরেজ ব্যাণ্ডমাষ্টারের নিকট ইংরাজী স্বরলিপি পড়িয়া খাঁটী বিলাতী কায়দায় বেহালা বাজাইতে শিখিলেন। হাবু দত্তর নিকট ফিড্‌ল শিখিলেন। নুলোগোপালের নিকট সাত বৎসর স্বরগ্রাম শিক্ষাই তাঁহাকে এই অনায়াসে বিদ্যা আয়ত্তের ক্ষমতা দিয়াছিল। থিয়েটারের দলে বাজাইতেন বলিয়া হাবু দত্ত মাসোহারা বাবদ কিছু টাকা আলাউদ্দীনকে দিতেন। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার খাওয়া থাকার কিছু উন্নতি হইল। বৎসর তিনেক হাবু দত্তর নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিয়া ও ঐকতানের দলে বহু প্রকার যন্ত্র বাজনা শিখিয়া সঙ্গীতে তিনি বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া, মনে মনে বেশ গর্ব্ববোধ করিতে লাগিলেন।

একবার দুর্গাপূজায় সময় তিনি স্থির করিলেন যে তিনি মুক্তাগাছা (অধুনা বাংলাদেশ) যাইবেন এবং তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দান করিবেন। কারণ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত এই মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরীর দরবারে বহু সঙ্গীত গুণীর সমাবেশ হয় এবং সেখানে রীতিমত সঙ্গীত চর্চ্চা হয়। তিনি সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দানের বাসনা লইয়া মুক্তাগাছা গেলেন ও রাজাবাহাদুরকে তাঁহার মনোবাসনার কথা বলিলেন। সঙ্গীত রসিক রাজা জগৎকিশোর আনন্দের সঙ্গে যুবকের বাজনা শুনিতে রাজী হইলেন। রাজাবাহাদুরকে আলাউদ্দীন খাঁ জানাইলেন যে, তিনি বহু প্রকার যন্ত্র বাজাইতে জানেন ও কণ্ঠ সঙ্গীতেও তাঁহার যথেষ্ট দখল আছে। পরের দিন সকালে তাঁহার সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দানের জন্য সময় নির্দিষ্ট হইল। নির্দিষ্ট সময়ে আলাউদ্দীন খাঁ দরবারে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে রাজা জগৎকিশোরের দরবারে আহম্মদ আলী খাঁ নামে একজন

প্রসিদ্ধ সরোদিয়া উপস্থিত ছিলেন। দরবারে আসন গ্রহণ করিয়া আলাউদ্দীন দেখিলেন যে শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া, আহম্মদ আলী খাঁ সরোদের তরফের তার মিলাইতেছেন। তার মিলাইয়া তিনি সরোদে "আলাপ" আরম্ভ করিলেন। আলাউদ্দীন বুঝিতে পারিলেন যে "তোড়ী" রাগের আলাপ হইতেছে। সরোদের ঝঙ্কার ও আলাপ শুনিয়া তাঁহার দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল। আবেগে অভিভূত হইয়া তিনি শিশুর মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন ও মনে মনে উপলব্ধি করিলেন যে এতদিন ধরিয়া যাহা শিখিয়াছেন তাহা সঙ্গীত বিদ্যার যৎসামান্য মাত্র। তিনি যে একজন এই বিদ্যায় পারদর্শী এ ধারণা তাঁহার দূর হইয়া গেল। ঘণ্টা দুই তিন ব্যাপী বাজনা শুনিবার পর তিনি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। তিনি আহম্মদ আলী খাঁর পদপ্রান্তে পড়িয়া অশ্রুজড়িত ব্যাকুল স্বরে তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা জগৎকিশোর যুবকের সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং আহম্মদ আলী খাঁকে অনুরোধ জানাইলেন যে আলাউদ্দীন খাঁকে তিনি যেন শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। আহম্মদ আলী খাঁ রাজা বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। রাজা জগৎ-কিশোর নিজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া দিলেন ও সেইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তাগাছার রাজ দরবারে আলাউদ্দীন খাঁ আহম্মদ আলী খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা জগৎকিশোর একখানি সরোদ আলাউদ্দীনকে উপহার স্বরূপ দান করিলেন।

আরম্ভ হইল আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গীত শিক্ষার আর এক অধ্যায়। আহম্মদ আলীর সহিত আলাউদ্দীন রামপুরে আসিলেন। সবসময়ে গুরুর সন্নিকটে থাকেন, ভৃত্যের ন্যায়, পাচকের ন্যায় গুরুর সেবা করেন। গুরু তাঁহাকে কিছু শিক্ষাদান করেন বা না করেন, তাহাতে তাঁহার কোন দুঃখ নাই। তিনি অসাধারণ স্মরণ শক্তিসম্পন্ন ও শ্রুতিধর ছিলেন। গুরু যখন নিজে রেওয়াজ করিতেন, তখন

বিভিন্ন রাগের "আলাপ" শুনিতে পাইতেছেন, "গৎ" শুনিতে পাইতেছেন, তাহাকেই তিনি সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন। "আলাপ ও গৎ" শুনিয়া মনে মনে তাহাকে আয়ত্ত করিতেন। কিছুদিন রামপুরে এইভাবে থাকার পর, আহম্মদ আলী খাঁ। তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহার নিকট আলাউদ্দিনের আর বিশেষ কিছুই শিখিবার নাই, এবং উপদেশ দিলেন তৎকালীন রামপুর নবাব দরবারের বিখ্যাত বীণকার উজীর খাঁর নিকট তিনি যেন শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। উজীর খাঁ, আহম্মদ আলী খাঁর ভাগিনেয়। কিন্তু তৎকালীন সময়ে উজীর খাঁর শিষ্যত্ব লাভ যেন স্বপ্নাতীত ব্যাপার। কিন্তু আলাউদ্দিন হাল ছাড়িলেন না। নানাপ্রকারে উজীর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উজীর খাঁর নিকট সরোদ শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া তিনি রামপুর ত্যাগ করিবেন না। উজীর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছাইল যে আফিং খাইয়া আত্মহত্যাই করিবেন স্থির করিলেন।

রামপুরের কোন এক মসজিদের মৌলবী সাহেব তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। রামপুরে এই মৌলবী সাহেব তাঁহার একজন শুভাকাঙ্খী ছিলেন। মৌলবী উপদেশ দিলেন, তিনি যেন রামপুরের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নবাবকে যেন আলাউদ্দীন তাঁহার আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করেন এবং কি উপায়ে নবাবের সহিত সাক্ষাত হইবে তাহাও বলিয়া দিলেন। নবাবকে দিবার জন্য একখানা দরখাস্তও মৌলবী লিখিয়া দিলেন। মৌলবীর উপদেশ মত পরের দিন যে রাস্তায় নবাব সান্ধ্যভ্রমণে ঘোড়ার গাড়ীতে বাহির হন, ঠিক সেই রাস্তার মধ্যখানে গিয়া আলাউদ্দিন পড়িলেন। নবাবের গাড়ী থামিয়া গেল, পেয়াদারা এইরূপ বেয়াদপির জন্য তাঁহাকে আটক করিয়া নবাবের সামনে হাজির করিল। আলাউদ্দিন ত তাহাই চান।

নবাব তাঁহাকে এইরকম আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আলাউদ্দিন মৌলবী লিখিত দরখাস্তটি নবাবকে পেশ করিলেন ও তাঁহার মনোবাসনার কথা জানাইলেন। নবাব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। দরখাস্তটি পড়িয়া ও আলাউদ্দিনের সহিত বাক্যালাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বেহালা বাজনা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। নবাব উজীর খাঁকে অনুরোধ করিলেন আলাউদ্দীনকে শিষ্য করিয়া লইবার জন্য। উজীর খাঁ নবাবের অনুরোধ রক্ষা করিলেন ও সেইদিনই তিনি উজীর খাঁর শিষ্য-গোষ্ঠীতে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন।

কিন্তু "নাড়া" বাঁধাই সার হইল। দুই, তিন বৎসর খাঁসাহেব আলাউদ্দীনকে কিছুই শিখাইলেন না। কিন্তু আলাউদ্দীন অন্যভাবে উপকৃত হইলেন। নবাবের একটি থিয়েটারের দল ছিল। বহু সঙ্গীত গুণী সেইসময়ে নবাবের দরবারে থাকিতেন ও মাসোহারা পাইতেন। আলাউদ্দীন ছিলেন ঐ দলের নেতা। থিয়েটারের দলে বেহালা বাজাইবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ পাইলেন ও তিনি ঐকতানের দলে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। এই ঐকতান দলের মাধ্যমে তিনি অন্যান্য গুণীদের নিকট হইতে যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের অনেক কিছু সম্পদ সংগ্রহ করিলেন। উজীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর দুই, তিন বৎসর এই ভাবেই কাটিয়া গেল। দুই তিন বৎসর পর উজীর খাঁর আলাউদ্দীনের প্রতি নজর পড়িল। তিনি পুত্রকে আদেশ করিলেন আলাউদ্দীনকে শিক্ষাদান করিবার জন্য। ইহার কিছুকাল পর হইতে নিজেও শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর শিক্ষাদান করিবার পর, উজীর খাঁ আলাউদ্দীনকে স্বাধীন ভাবে সঙ্গীত চর্চ্চা করিবার অনুমতি দিলেন। সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে, আলাউদ্দীন খাঁ পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার অল্প কিছুকাল পরেই মৈহারের মহারাজ ব্রজনাথ, তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করিয়া মৈহার লইয়া

যান ও সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে মৈহারেই বাস করেন। সুদীর্ঘ কাল পরে তাঁর স্ত্রী মদিনা বেগমকে লইয়া মৈহারেই তাঁহার সংসার পাতিলেন। মৈহারেই ওস্তাদের ঘরবাড়ী, মৈহারেই তাঁহার "মদিনা ভবন"।

আনুমানিক ১৯৩৫/১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উদয়শঙ্করের অনুরোধে তিনি বৎসর খানেকের জন্য ইউরোপ সফরে যান। সম্প্রতি, দুই মাসের জন্য তিনি "বিশ্বভারতীর" ভিজিটিং প্রফেসার ছিলেন। ভারত সরকার তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময়ে যে কয়েকজন সঙ্গীত গুণী এই সম্মানে ভূষিত হন, তাঁহাদের মধ্যে আলাউদ্দীন ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ।

আলাউদ্দীন খাঁ সরোদিয়া বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন, তিনি সরোদ বাজাইবার সময় বামহাতে জবা ও ডানহাতে তারের উপর সুরের কাজ করিতেন। তিনি কণ্ঠ সঙ্গীতে ধ্রুপদ, ধমার, এবং যন্ত্রে পাখোয়াজ, তবলা, ঢোল, খোল, বেহালা, সুরশৃঙ্গার, বীণা, বাঁশী, ক্ল্যারিওনেট, ফিডল, কর্নেট, শানাই ইত্যাদিতেও সমান দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে সমান দক্ষতা থাকায় তাঁহার "বাজের" একটি স্বতন্ত্র ধরণ ছিল। "মসিদ খানি" বা "রেজাখানি" কোন বাজেরই তিনি অনুকরণ করেন নাই। তাঁর "বাজে" অনিবদ্ধ বা নিবদ্ধ সব কিছুতেই উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমস্ত পদ্ধতির ঢঙ ও ছন্দ, নানারূপে প্রকাশ করিতেন। ছন্দ বৈচিত্র্যই ছিল তাঁহার "বাজের" বৈশিষ্ট্য। রবাব, বীণ, সুরশৃঙ্গারের তারপরণ গতের মাধ্যমে তান, তোড়া বিস্তার ও তাহার মধ্যে টপ্পা ও ঠুংরীর মিষ্টত্ব, ধ্রুপদের ছন্দবৈচিত্র্য সবকিছুরই সমাবেশ হইত একটি রাগের মধ্যে। তিনি বহু নূতন রাগের স্রষ্টা যথা "হেমন্ত", "শোভাবতী", "উমাবতী", "মদিনা মঞ্জরী", ইত্যাদি। বর্ত্তমান কালে তাঁহার মতন, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতগুণী বোধ হয়

আর কেহই ছিলেন না। পূর্ব্ব প্রচলিত বহু রাগ ও সঙ্গীত পদ্ধতি তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহা আর কাহারও নিকট ছিল না। তিনি ছিলেন উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। নৈতিক চরিত্রবল তাঁহার ছিল অসাধারণ। গুরুগৃহে শিক্ষাকালীন বহুমলিন পরিবেশের মধ্যে তাঁহাকে দিনযাপন করিতে হইয়াছে। সরস্বতীর বরপুত্র তিনি সরস্বতীর বাহনের মতই তিনি চরিত্রের চিরশুভ্রতা বজায় রাখিয়াছেন চিরকাল। কোন কিছুই তাঁহার অবহেলার ছিলনা। যে কোন ধর্ম, যে কোন সঙ্গীত, ধনী দরিদ্র যে কোন মানুষ, সবই তাঁহার নিকট আদরের ছিল। ইউরোপ সফরের সময় বিদেশী সংগীতও তিনি খুব আনন্দ সহকারে শুনিতেন, তাহার অন্তর্নিহিত রসটুকু গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। খাঁটী বিলাতী কায়দায় বহু পূর্ব্বেই তিনি বেহালা বাদ্যের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে ও জনসমাজে তিনি "বাবা" বলিয়াই পরিচিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ওস্তাদ আলাউদ্দীনের সহিত আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় লাভের যে সৌভাগ্য হইয়াছিল তাহার বিবরণ আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব যন্ত্রসঙ্গীতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং আমি কণ্ঠ সঙ্গীতের পরীক্ষক নিযুক্ত হই। ঘটনাচক্রে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঙ্গীতানুরাগী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে মাসাধিক কাল আমরা দুই জনে অতিথি রূপে অবস্থান করি। সেই সময় হইতে আমি ওস্তাদজীর সহিত ঘনিষ্ঠ স্নেহপাশে বদ্ধ হই এবং তাঁহার নিকট হইতে সঙ্গীতের বহু দুরূহ বিষয় শিক্ষালাভ করি। সেই সময় হইতে তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ও মধ্যে মধ্যে যখনই কলিকাতা আসিতেন তখনই তিনি আমার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। এমনকি

একদিন তিনি আমাদের বেঙ্গল মিউজিক কলেজের ১০ নম্বর ডোভার লেনের গৃহে, রবিবার সকালে আকস্মিক ভাবে আসেন ও সাক্ষাতের নিমিত্ত আমার অনুসন্ধান করেন। (কারণ মহাবিদ্যালয় আরম্ভ হইবার একঘণ্টাকাল পূর্ব্বেই তিনি আসেন)। টেলিফোন যোগে খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমি চলিয়া আসি। কলেজ আরম্ভ হইবার পরে আমি তাঁহাকে মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি ও তিনি অতি আগ্রহের সহিত সমস্ত বিভাগগুলি পরিদর্শন করেন। অবশেষে ওস্তাদজীকে আমি সঙ্গে করিয়া তাঁহার পুত্র ওস্তাদ আলী আকবরের গৃহে পৌঁছাইয়া মহাবিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

শিশুকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সঙ্গীত সাধনা করিয়াও ওস্তাদজীর সঙ্গীত পিপাসা মেটে নাই। বিশ্বভারতীতে ভিজিটিং প্রফেসার হইয়া অভ্যর্থনা সভায় তিনি বলিয়াছেন "এখনও সঙ্গীত শিক্ষা আমার শেষ হয় নাই"। "মদিনা ভবনের" বাগানের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ দেখাইয়া বাবা শিষ্যদের বলিতেন, "এখানে আমার কবর হবে। এখানে আমার শেষশয্যা হবে, এর পাশে বাঁধান চত্বর থাক্‌বে, সেখানে বসে তোমারা রেওয়াজ করবে, আমি কবরের ভিতর শুয়ে শুয়ে শুন্‌ব।"

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর একপুত্র ও তিন কন্যা। পুত্র স্বনামধন্য সরোদিয়া আলী আকবর খাঁ। ওস্তাদজীর বর্ত্তমানেই মধ্যম কন্যার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যা এখনও বর্ত্তমান আছেন। কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণাশঙ্কর পণ্ডিত রবিশঙ্করের স্ত্রী। পুত্র, কন্যা, জামাতা ও পৌত্র ছাড়াও বর্ত্তমান কালের বহু স্বনামধন্য যন্ত্রী মৈহারে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও মৈহারে থাকিয়া শিক্ষাগ্রহণ করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। যথা, ভ্রাতুষ্পুত্র ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, তিমিরবরণ, মৈহারের মহারাজা ব্রজনাথ, পান্নালাল ঘোষ, রামদাস খাঁ, রবীন ঘোষ, রাম গাঙ্গুলী, জ্যোতিকিশোর আচার্য্য

চৌধুরী, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর, রাত্রি ১১ ঘটিকায় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ মহাপ্রয়াণ করেন। বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে তিনি কিছুকাল হইতেই শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুদিবস, হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মেরই ছিল একটি পবিত্র দিন। মুসলমান ধর্মের "শবেমেরাজ" ও হিন্দুধর্মের অঘোর চতুর্দ্দশী ব্রতের রাত্রি। মুসলমান ধর্মের মতে, শেষ নমাজের সময় যদি কাহারো দেহান্তর ঘটে, তবে তিনি পয়গম্বরের অংশ ও হিন্দু ধর্মমতে ঐ রাত্রে দেহাবসান ঘটিলে "শিবলোক" প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বিবাদী, ধর্মভীরু, ভারতের একনিষ্ঠ সংগীতসাধক উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যদিনে মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে ছোট্ট মৈহার শহরের সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সর্ব কুসংস্কারের উর্দ্ধে উঠিয়া (সারদা মায়ের পাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া দীন দরিদ্র হিন্দু মুসলমানের প্রত্যেকে) তাঁহার সমাধি ক্ষেত্রে ফুলের মালা দিয়া তাঁহাকে শেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর দেহাবসানে ভারতবর্ষের সংগীত সাধনার ক্ষেত্রে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহা কোনদিনই পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অন্তহীন সংগীত সাধনার যে ইতিহাস তিনি তাঁহার জীবন ব্যাপী সংগীত সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের অস্থিরতা ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাহা অকল্পনীয়। তাঁহার মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত জগতের একটি যুগের অবসান ঘটিল।

॥ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতন ঝন্‌কার ॥

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত মহারাষ্ট্রীয় পরিবারে ডঃ শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনঝন্‌কারের জন্ম হয়।

তাঁর পিতার নাম শ্রীনারায়ণ রাও রতনঝন্‌কার। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পুলিশ অফিসের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও অবসর সময়ে নিজে সেতার সাধনা করিতেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে একজন ভাল সংগীতজ্ঞ হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ মাত্র সাতবৎসর বয়সে স্বর্গীয় ওস্তাদ্ কৃষ্ণভট্ট হোনাওয়ারের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। একবছরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের খুব ভাল স্বরজ্ঞান হয়। এর কাছে প্রায় আড়াই বৎসর কাল সংগীত শিক্ষার পর তিনি "অন্ধ্" এর শ্রীঅনন্ত মনোহর যোশীর নিকট কিছুদিন শেখেন।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের বাল্যবন্ধু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা শ্রীনারায়ণ রাও। শ্রীকৃষ্ণ যখন কৃষ্ণভট্ ও অনন্তমনোহরের নিকট সংগীত সাধনায় ব্যস্ত সেই সময় পণ্ডিত ভাতখণ্ড লিখিত সংগীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এবং মারাঠী ভাষায় রচিত "হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি"-র প্রথম ভাগ শ্রীনারায়ণ রাও-এর হস্তগত হয় এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নিকট দেওয়াই মনস্থ করেন। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিতজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর নিকট সংগীত সাধনা শুরু করেন। [এই সময় আমেদ নগরে স্বর্গীয় ওস্তাদ্ আব্দুল করিম খানের সংস্পর্শে তিনি আসেন। তাঁর সঙ্গে কিছু সংগীত আসরেও উপস্থিত থাকেন। এবং সংগীতের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে নানা আলোচনা করেন]।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ রতন ঝন্‌কার বরোদায় প্রথম সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন এবং সংগীত পরিবেশন করেন। এই সময় পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সৌজন্যে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য এই পরিচয়ে মহারাজা শিবাজী রাও গাইকোয়াড়ের সহিত পরিচিত হন। কিছু অর্থ রাজ্যভাতা হিসাবে পেতে থাকেন এবং "দর্বার" সংগীতজ্ঞ "আফ্‌তাবে মৌসিকী" ওস্তাদ্ ফৈয়াজ হোসেন খানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। ওস্তাদ্ ফৈয়াজ খান্ সাহেবও

রতনঝন্‌কারের মত সুকণ্ঠ এবং ভাতখণ্ডেজীর নূতন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত ছাত্রকে মনপ্রাণ দিয়ে শেখাতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রকে বেশ তৈরী করে নেন। অতঃপর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রতনঝন্‌কার ওস্তাদজীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং এমনাকি দরবারেও গান গাইতে শুরু করেন।

রতনঝন্‌কার ১৯১৮-তে দিল্লী এবং ১৯১৯ সালে বারানসীতে সর্ব্বভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনে যোগদান করেন। এবং অতঃপর বহু সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। যথাক্রমে ১৯২৪ ও ১৯২৫ খ্রীঃ লক্ষ্ণৌ-তে অনুষ্ঠিত চতুর্থ এবং পঞ্চম সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের ফলস্বরূপ ১৯২৬ খ্রীঃ লক্ষ্ণৌ মরিস্‌ কলেজ (বর্তমানে ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয়) স্থাপিত হয়। এর মধ্যে রতনঝন্‌কার বোম্বাইয়ের উইল্‌সন কলেজ থেকে স্নাতক হন। প্রথমে কণ্ঠসংগীতের অধ্যাপক হয়ে ১৯২৬ খ্রীঃ তিনি মরিস্‌ কলেজে যোগদান করেন। এবং ১৯২৮ খ্রীঃ কলেজের সর্ব্বভার প্রাপ্ত হন। এই সময় থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ভাতখণ্ডেজী মাঝে মাঝে কলেজে যেতেন ও নানারকম ভাবে রতনঝন্‌কারকে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে কলেজের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন।

কিছুদিন অধ্যাপনা করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেই রতন্‌ঝন্‌কার পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন রাগের বহু তান রচনা করে "তানসংগ্রহ" নামে পুস্তকটি প্রকাশ করেন। ভাতখণ্ডেজী ইহাকে খুব উচ্চ প্রশংসা করেন এবং আরও নূতন নূতন গান ও লক্ষণগীত রচনা করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে রতন্‌ঝন্‌কার কিছু নূতন রাগ সৃষ্টি করেন। তিনি "সংগীত শিক্ষা" নামক প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকটি রচনা করেন। তিনি হস্তসংকেতের মাধ্যমে সংগীতের স্বরজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার প্রবর্তন করেন। এবং এই ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। তিনি সর্বসাকুল্যে এক ডজন সংগীত সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সম্মেলনে ও আকাশবাণীর মাধ্যমে প্রচারিত তাঁর বিভিন্ন কথিকাও বিশেষ মূল্যবান্। তিনি তাঁর মাতৃভাষা ছাড়াও ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটী ইত্যাদি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ডঃ রতন্‌ঝন্‌কার সিংহলে সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৪৯ ও ১৯৫২ সালে দুইবার সিংহলে গিয়েছিলেন। এছাড়া ১৯৫২ থেকে কেন্দ্রীয় অডিশন্ বোর্ডের সহ সভাপতিরূপে ছিলেন। তিনি আকাশবাণীর সংগীত সম্বন্ধীয় পরামর্শ সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ তাঁকে "সংগীতাচার্য্য" (Doctor of music) এই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৬ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকার খয়রাগরে ইন্দিরা কলা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এবং তার প্রথম উপাচার্য রূপে রতন্‌ঝন্‌কার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারগ্রহণ করেন। তিনি ভারত সরকারের সংগীত নাটক একাদেমী-র সভ্য ছিলেন। এছাড়া সারাজীবন অখণ্ড সংগীত সাধনায় নিজেকে তিনি নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। বহু সম্মান ও শ্রদ্ধা সারাজীবন তিনি পেয়েছেন। সংগীত জগতে শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনঝন্‌কারের নাম চিরকাল ধ্রুবতারার মত চিরভাস্বর স্থান গ্রহণ করে থাকবে।

তাঁর বহু শিষ্য শিষ্যা সংগীত জগতে বিশেষ স্থান অর্জন করে আছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত ও কলা বিভাগের ডীন্ শ্রীমতী মুডটকার, অধ্যাপক ডঃ শত্রুঘ্ন শুক্লা, বিখ্যাত বেহালাবাদক শ্রী ভি. জি. যোগ, বোম্বাইয়ের শ্রী কে জি. গিণ্ডে, শ্রী এস্ সি. আর্. ভট্ট, শ্রী দীন্‌কার কিন্‌কিনী। এছাড়া কলকাতার শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়, ৺রবীন্দ্র লাল রায়, ৺পাহাড়ী সান্যাল, শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল, শ্রীপঞ্চানন

মুখোপাধ্যায়, ৺ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক স্বয়ং এবং আরও অনেকে।

সংগীতের এই মহান্ সাধকের ১৯৩৪ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই প্রদেশে মহাপ্রয়াণ হয়। সকল সংগীতগুণী, সংগীতরসিক, সমগ্র সংগীতসমাজ চিরদিন সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁহার নাম স্মরণ করিবে।

॥ সংগীত ও শ্রীঅমিয় মাধব রায়চৌধুরীর জীবনদর্শন ॥

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।"

এই চির শাশ্বত কালের প্রশ্ন যুগে যুগে জেগেছে মানুষের অন্তরে, সেই প্রশ্ন ফুটে উঠেছে তার সংগীতের মাঝে, তার সুরে। সেই একই প্রশ্নের সমাধানে যুগে যুগে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দার্শনিক, আর সেই অন্ধকারময় জগতে নূতন আলোকের পথ দেখিয়েছেন বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মুনি, ঋষি ও মহাপুরুষগণ।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবি ও সংগীতজ্ঞরা সেই প্রশ্নের সমাধান করে গেছেন তাঁদেরই রচনায়, সুরে, সংগীতে। তাঁদের সেই রচনার সুরই বেজে উঠেছে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, সংগীত-রসিক শ্রীঅমিয়মাধব রায়চৌধুরীর সরল সাধারণ জীবনাদর্শে, ব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রতিটি উক্তিতে, পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর সরল সাধারণ বক্তব্যের মাঝখানে।

অমিয়মাধব বলেন, "সত্যম্ পরং ধীমহি", সত্য এক, ধর্ম এক। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—একমাত্র সত্যই ব্রহ্ম যিনি আকারে নিরাকারে, গুণে নির্গুণে, স্থাবরে জঙ্গমে, সারা বিশ্বচরাচরে বিরাজমান—তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত। সেই তাঁকে, সেই

আপনজনকেই জানাই সেই বিশ্বনিয়ন্তার রসাস্বাদন করাই সুখ,—আনন্দ। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। অমিয়মাধবের এই বক্তব্যের মাঝে যেন কবি রজনীকান্তের সেই বিখ্যাত গানের কলির অনুরণনই শোনা যায়—

"তুমি অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল হরি হে;—
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি
আমি কেন ভেবে মরি হে।"

অমিয়মাধব বলেন, "ব্রহ্ম বা তিনি অন্তরের বস্তু। তাঁকে পেতে হলে গেরুয়া নিতে হয় না, জটাও রাখতে হয় না, নির্জনে বনে জঙ্গলে পাহাড়েও যেতে হয় না। তিনি যে আমাদের সবচেয়ে প্রিয়তম। তাঁর সংগীত সর্বদাই বেজে চলেছে আমাদের অন্তরে। আমরা শুনেও তা শুনতে পারছি না। অন্তরের বস্তুকে অন্তরেই খোঁজো। বিশ্বকবির বহু রচনার মধ্যেও এই একই আদর্শ ফুটে উঠেছে। যেমন—

(ক) "মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন 'পরে
....
জীবনে আমার সংগীত দাও আনি
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী
....
হৃদয় পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে-
প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো।

(খ) আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে,
দেখতে আমি পাইনি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি,
আমার হৃদয়পানে চাইনি।

(গ) কার মিলন চাও বিরহী—
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব অরণ্যে
কুটিল জটিল গহনে শান্তিসুখহীন ওরে মন।
দেখো দেখো রে চিত্তকমলে
চরণপদ্ম রাজে হায়!
অমৃতজ্যোতি কি বা সুন্দর ওরে মন ॥

আমাদের এ সংসার কণ্টকময়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিপদ বিষাদ। স্বার্থান্বেষী কীটেদের যন্ত্রণায় জীবন হয় অতিষ্ঠ। কিন্তু এই চরমদুর্দিনেও সংগীতই দেয় একমাত্র সান্ত্বনা, যোগায় ধৈর্য। অমিয়মাধব বলেন, "ধৈর্যই হচ্ছে বীর্য্য, শক্তিই হচ্ছে আনন্দ।" সকল সময় তাঁকে চিন্তা কর, তাঁর শাশ্বত সংগীত জীবন বীণার প্রতিটি তন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠলে আপনিই শান্তি আসবে। তাই কবি অতুলপ্রসাদের আকুলতা ফুটে উঠেছে—

"তুমি গাও, তুমি গাও গো,
গাহো মম জীবনে বসি,
বেদনে বাঁধা জীবনবীণা
ঝঙ্কারি বাজাও
তুমি গাও....
....
....

দগ্ধ যবে চিত্ত হবে
এ মরু সংসারে
স্নিগ্ধ করো মধুর সুরধারে।
তোমার যে সুরে ছন্দে
পাখিরা গাহে আনন্দে,
শিষ্য করি আমারে
সে সংগীত শিখাও—
তুমি গাও ।।

অমিয়মাধব বলেন, "নিজেকে শূন্য করে দাও, তিনিই সব পূর্ণ করে দেবেন।" এই অতি সাধারণ একটু কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে কি বিরাট উপলব্ধি, কি বিশাল নির্ভরশীলতা! এই নির্ভরশীলতাই ছিল অতুলপ্রসাদের প্রাণে যা ফুটে উঠেছিল তাঁর সংগীতে—

"তুমি দাও গো দাও মোরে
পরাণ ভরি দাও
তখন নিয়ো গো নিয়ো
যত তুমি চাও।
....
....
শূণ্য আঁধারে এসেছি দুয়ারে
দিবে কি ভরিয়া রতন সম্ভারে
ঘুচাও ঘুচাও মোর দৈন্য ঘুচাও ।।"

অনন্যশরণ হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্তি উদ্ধারের পথ। এই মুক্তিই তো আমাদের সকল মানবের একান্ত কাম্য। এই মুক্তি পাবার নেশাতেই আমরা করে চলেছি কত ভ্রান্ত অভিনয়। যেগুলি সাময়িক কালের জন্যই আনন্দদায়ক, তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু এই আনন্দদায়ক

অনুষ্ঠানকে সফল করার উদ্দেশ্যে সবশেষে সেই বিশ্বনিয়ন্তাকেই আমরা করি নির্বাসিত। এই নিষ্ঠুর সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বকবি। তাই তিনি সকল অভিনয়কে ত্যাগ করে আকুল সুরে প্রার্থনা জানিয়েছেন সেই সত্যময় পুরুষের কাছে। তাঁকে স্মরণ করে মন, প্রাণ, বিসর্জন করেছেন তাঁরি কাছে,—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে,
তোমার পানে।
....
....
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে,
তোমার গানে।

এই আত্মসমর্পণ করে কৃতার্থ হয়েছেন কবি রজনীকান্ত। এই অনন্যশরণ, এই অগাধ বিশ্বাস তাঁকে সাহায্য করেছে মৃত্যুকেও —"তোমার রসাল নন্দন" ব'লে মনে করতে। তাই প্রথমে আকুলতা—

"কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা করে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।"

অবশেষে হাসি মুখে সকল সুখ দুঃখকে মেনে নিয়ে গেয়ে উঠেছেন,—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।"

অমিয়মাধবও বলেন, "জীবনে সুখ দুঃখকে সমান করে নাও। সবই তো মনের খেলা। অহমিকা ত্যাগ কর। সকলই তাঁর ইচ্ছা। তোমার এ সংসারে কিছুই নয়। এ দেহটাকেও ফেলে

রেখে চলে যেতে হবে। তুমি তার কিন্তু তিনি সবার।" এই উপলব্ধিই দেখতে পাই কান্ত-কবির রচনায়—

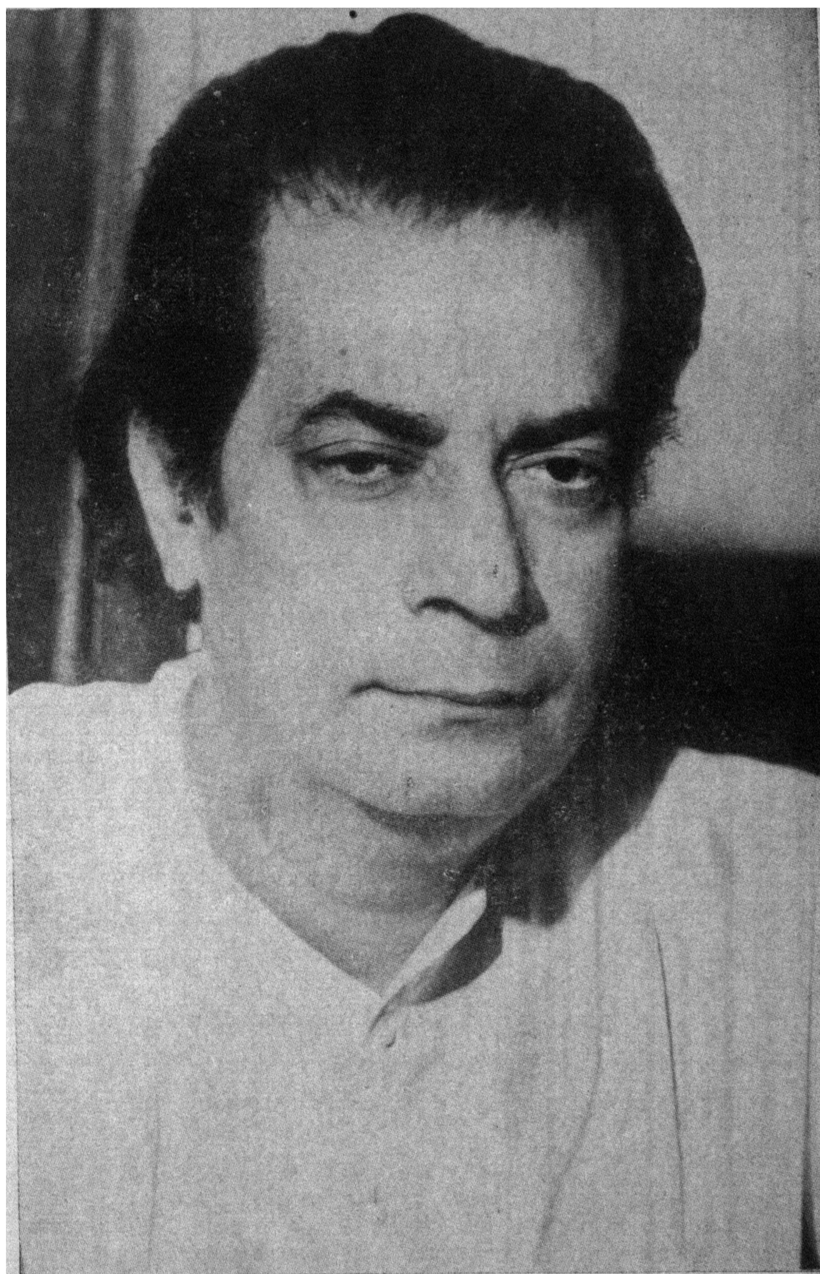
"আমিও তোমারি গো,
তোমারি সকলি ত,
জানি এ জানে না, এ মোহ-হতচিত
আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হ'ল হেন,
ভাঙ্গো এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

আবার একইভাবে ভাবিত ছিলেন কবি রামপ্রসাদ। তাই তাঁর রচনায় দেখতে পাই—

"সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি।"

বিশ্বকবি তাঁর রচনায় লিখেছেন—' যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করাইয়া দেখাইতে পারেন তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান ; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা ; পূর্ণতাই সরলতা, ধর্ম সেই পরিপূর্ণতা, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রেমন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়া কর্মে জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনই গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক একজন অধ্যবসায়ী এক 'এক নূতন পথ কাটিয়া নবনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে



শ্রীদাদাজী

জগতে বিরোধ, বিদ্বেষ, অশান্তি—অমঙ্গলের আর সীমা নাই।" তাই অমিয়মাধবের বক্তব্য, প্রয়োজন নাই জটিলতার, প্রয়োজন নাই ধর্ম লইয়া সাম্প্রদায়িকতার। সকলেই সেই মহানের সৃষ্ট, সকলেই ভাই বোন। দরকার নাই কলহের। সবাই মানুষ। মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই তাঁর বক্তব্য—"মানুষ কখনই গুরু হতে পারে না। ঈশ্বরই একমাত্র গুরু।" "নামই একমাত্র মুক্তির পথ।" তবেই জীবন হ'য়ে উঠবে মধুর সংগীতময়। সংগীতই হ'য়ে উঠুক মন্ত্র। বিশ্বকবির ভাষায়, ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না, ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত।" এই জটিলতা লক্ষ্য করে বেদনায় বিদ্ধ হয়েছেন অমিয়মাধব। তাঁর মতে, প্রয়োজন নাই বাহ্যিক পূজা আর্চার। প্রয়োজন নাই সাংঘাতিক আচার বিচারের। তাঁকে পৃথকভাবে বাইরে স্থাপন করে ঘটা করে পূজা অনর্থক। তাঁকে অপরজন ভাবাইতো নিজেকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। কী সাংঘাতিক নিষ্ঠুর আমরা। পূজার নামে কি প্রহসন করে চলেছি। নিরীহ পশু বধ করে, তাঁরই সৃষ্ট জীব হত্যা করে করছি তাঁরই আরাধনা। এই নিষ্ঠুরতা আজ নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তাই শিশুকালেই অমিয়মাধব বিদ্রোহী হয়ে পিতাকে বলেছিলেন, "বন্ধ কর এই বলি উৎসব। যাঁকে বলছ প্রেমময় তাঁরই পূজায় প্রেমের এই রূপ? নিবেদন কি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সরগোল করার বিধি? প্রেম নিবেদন তো অন্তরের প্রদীপ-জ্বালিয়ে নিভৃতে নিরালায় অতি সঙ্গোপনে। যাঁর পূজা তিনিই ক'রে নেবেন সব—শুধু অন্তরের দীপশিখাকে প্রজ্বলিত রেখে যাওয়া। সেই সত্যকে, সেই পূর্ণ পুরুষোত্তমকে জেনো আপন অন্তরে, "ত্বং বেত্তং পুরুষং বেদ।" এই একই আবেদন ফুটে উঠেছে বিশ্বকবির বিখ্যাত গানে—

"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি,
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।।

ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়ার
পিছন হতে পাইনে সুযোগ চরণ ছোঁওয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি ॥
দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি ॥
কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়—
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়,
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি ॥

এই একই কথা শুনিয়ে গেছেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নিলীমা।"

চোখের জলে গানের সুরে মীরাবাঈ তাই বলেছেন—

"পাথর পূজনে সে হরি মিলে তো
ম্যায় পূঁজু পাঁহাড়।"

সংগীত ও জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার জীবনের প্রধান কাম্য সেই সর্বনিয়ন্তার উপলব্ধি, তাঁকে পাওয়া। সংগীত, সুরের মাধ্যমেই অতি সহজে জটিলতাকে স্পর্শ না করে, আচার বিচারের উর্দ্ধে গিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তাই যে প্রেম আপনি খোলে, মুক্তির চরম সার্থকতা যে নিরাসক্ত প্রেম, সেই প্রেমই সুর, সেই প্রেমই আনন্দ, সেই প্রেমই "রাম"—প্রাণারাম আনন্দ প্রেমময়, সত্যময়, মহান ঈশ্বর। সেই প্রেমই সংগীত, সুর—নাদব্রহ্ম—চিরসত্য। সেই সত্যই সর্বভূতন্বিত হ'য়ে সবকিছুকে অয়ণ করছেন তাই সত্যনারায়ণ। সংগীত এই সত্যনারায়ণেরই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। সত্তার পুলকের বিকিরণ। তাই জীবনের সত্য এই সংগীতেই প্রতিষ্ঠিত এবং উজ্জীবিত। "সংগীতাৎ ন পরম্ কিঞ্চিৎ।"

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী রচিত ১০ ঠাটের নাম ও তাহাদের কর্ণাটকী নাম

ভাতখণ্ডেজী রচিত ১০টি ঠাট		কর্ণাটকী নাম
১।	বিলাবল	ধীরশঙ্করাভরণ
২।	কল্যাণ	মেচ কল্যাণী
৩।	ভৈরব	মায়ামালব গৌল
৪।	খমাজ	হরিকাম্বোজী
৫।	পূর্ব্বী	কামবর্দ্ধিনী
৬।	মারবা	গমন শ্রী
৭।	কাফি	খরহরপ্রিয়
৮।	আশাবরী	নট ভৈরবী
৯।	ভৈরবী	হনুমত তোড়ী
১০।	তোড়ী	শুভপশু বরালী

পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখী রচিত জনকঠাটের ১৯টি নাম

১।	মুখারী	৭।	ভৈরবী	১৩।	দেশক্ষী
২।	সামবরালী	৮।	শ্রীরাগ	১৪।	নাট
৩।	ভূপাল	৯।	হেজুজ্জী	১৫।	শুদ্ধবরালী
৪।	বসন্ত ভৈরবী	১০।	কাম্বোজী	১৬।	পন্তুবরালী
৫।	গৌল	১১।	শঙ্করাভরণ	১৭।	শুদ্ধ রামক্রি
৬।	অহোরী	১২।	সামন্ত	১৮।	সিংহরব
				১৯।	

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুযায়ী পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী রচিত ক্রমিক পুস্তক মালিকার দ্বিতীয় খণ্ডে যে কয়টি রাগের নাম আছে প্রত্যেকটী রাগই জনক ঠাট, শুদ্ধ ঠাট, বা আশ্রয় রাগ নামে পরিচিত।

পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখী রচিত ৭২ ঠাটের নাম

১। কনকাম্বরী
২। রত্নাঙ্গী
৩। সামবরালী
৪। ভানুমতী
৫। মনোরঞ্জনী
৬। তনুকীর্ত্তি
৭। সেনাগ্রনী
৮। তোড়ী
৯। ভিন্নষড়জ
১০। নটাভরণ
১১। কোকিলরব
১২। রূপবতী
১৩। হেজুজ্জী
১৪। বসন্ত ভৈরবী
১৫। মায়া মালব গৌল
১৬। বেগবাহিনী
১৭। ছায়াবতী
১৮। শুদ্ধ মালবী
১৯। ঝংকার ভ্রমরী
২০। রীতি গৌল
২১। কিরণাবলী
২২। শ্রীরাগ
২৩। গৌরী বেলাবলী
২৪। বীর বসন্ত
২৫। শারাবতী
২৬। তরঙ্গিনী
২৭। সৌরসেনা
২৮। কেদার গৌল
২৯। শঙ্করাভরণ
৩০। নাগাভরণ
৩১। কলাবতী
৩২। চূড়ামণি
৩৩। গঙ্গাতরঙ্গিণী
৩৪। ছায়ানট
৩৫। স্থূলিনী
৩৬। চলনাট
৩৭। সৌগন্ধিণী
৩৮। জগমোহিণী
৩৯। বরালিকা
৪০। নভিমণি
৪১। কুম্ভিণী
৪২। রবিক্রিয়া
৪৩। গীর্ব্বণী
৪৪। ভবানী
৪৫। শুভপন্তুবরালী
৪৬। স্তবরাজ
৪৭। সৈবিকা
৪৮। জীবন্তিকা
৪৯। ধবলাঙ্গ
৫০। নামদেশী

৫১। রামক্রিয়া
৫২। রমামনোহারী
৫৩। গমন ক্রিয়া
৫৪। বংশাবতী
৫৫। শ্যামলা
৫৬। চামরা
৫৭। সিংহেন্দ্র মধ্যম
৫৮। সিংহরব
৫৯। ধামবতী
৬০। নৈষধ
৬১। কুণ্ডল
৬২। রতিপ্রিয়া
৬৩। গীতপ্রিয়া
৬৪। ভূষাবতী
৬৫। শান্ত কল্যাণ
৬৬। চতুরঙ্গিণী
৬৭। জৈতী
৬৮। সন্তানমঞ্জরী
৬৯। ধৈতপঞ্চম
৭০। নাসামণি
৭১। কুসুমাকর
৭২। রসমঞ্জরী

কর্ণাটকী তাল চিহ্ন

১। দাদরা, ৬ মাত্রা = $\overset{\circ}{|}$

২। সুলতাল, ১০ মাত্রা = | 0 |

৩। ঝাঁপতাল, ১০ মাত্রা = 0 $\breve{|}$ $\breve{0}$

৪। একতাল, ১২ মাত্রা = | | 0 0

৫। চৌতাল, ১২ মাত্রা = | | 0 0

৬। বিক্রমতাল, ১২ মাত্রা = 0 $\overset{\circ}{|}$ |

৭। ত্রিতাল ১৬ মাত্রা = | S |

৮। তিলওয়াড়া ১৬ মাত্রা = | S |

৯। ধমার ১৪ মাত্রা = $\breve{|}$ $\breve{|}$ |

১০। ঝুমরা ১৪ মাত্রা = $\breve{0}$ $\breve{0}$ |

১১। দীপচন্দী ১৪ মাত্রা = $\breve{0}\ \breve{0}$ | |

১২। আড়াচৌতাল ১৪ মাত্রা = 0 | | |

১৩। গজঝম্পা ১৫ মাত্রা = | | | $\breve{0}$

১৪। শিখর ১৭ মাত্রা = 0 0 0 $\breve{0}$ | |

১৫। সওতাল ১৮ মাত্রা = | 0 | 0 0 |

১৬। ব্রহ্মতাল ২৮ মাত্রা = | 0 | 0 0 | 0 0 0 0 |

১৭। সোয়ারী ১৫ মাত্রা = $\breve{0}$ | | |

১৮। রুদ্রতাল ১১ মাত্রা = ⌣0⌣⌣0⌣⌣0

১৯। লক্ষ্মীতাল ১৮ মাত্রা = ⌣⌣ 0 ⌣⌣ 0 ⌣⌣⌣⌣ 0

২০। বিষ্ণুতাল ১৭ মাত্রা = 0 $\breve{0}$ | | |

যতি শিখর তাল, বসন্ত তাল, গণেশ তাল—, মণিতাল, ঝম্পা-তাল, ঠেকাটপ্পা, অদ্ধা ত্রিতাল, পস্তো তাল, ঠেকা কওয়ালী।

প্রমাণ শ্রুতি (Short Notes) ষড়জ গ্রামের পঞ্চম হইল ১৭ শ্রুতি। মধ্যম গ্রামের পঞ্চম হইল ১৬ শ্রুতি, এই দুটির পার্থক্যকে প্রমাণ শ্রুতি বলা হয়।



Major Tone, Minor Tone and Semi Tone

Major Tone—চতুশ্রুতিস্বর যথা—সা ; ম ও প, (ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম)

Minor Tone—ত্রিশ্রুতিকস্বর—যথা, রে ও ধ (ঋষভ ও ধৈবত)

Semi Tone—দ্বিশ্রুতিকস্বর—যথা—গ ও নি—(গান্ধার ও নিষাদ)

অর্দ্ধদর্শকস্বর ও মধ্যমের মাহাত্ম্য

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অনুসারে গীত ও বাদ্যের সময় "মধ্যম" স্বরের স্থান অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। এই স্বর রাগের সময় নিরূপণের পথ প্রদর্শক। সেজন্য এই স্বরকে অর্দ্ধদর্শক স্বর বলা হয়। প্রাতঃকালীন রাগে শুদ্ধ মধ্যমের রাজত্ব থাকে। কোমল রে ও ধ যুক্ত সন্ধিপ্রকাশ রাগে যদি শুদ্ধ মধ্যমের প্রাবল্য থাকে তাহা হইলে সেই রাগ প্রাতঃকালীন "সন্ধি প্রকাশ" রাগ হইবে। যদি শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্ত্তে তীব্র মধ্যমের প্রাধান্য থাকে তাহা হইলে সায়ংকালীন "সন্ধি প্রকাশ" রাগ হইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, শুদ্ধ মধ্যম প্রাতঃকালীন রাগ ও তীব্র মধ্যম সায়ংকালীন রাগের সূচনা দিয়া থাকে। যথা ইমন, কামোদ, কেদার, হামীর ইত্যাদি তীব্র মধ্যম যুক্ত রাগ রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া হইয়া থাকে। ইহার পর শ্রী পূর্বী ইত্যাদি রাগ গাওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত দেখা যায়, ইহার পর রাত্রি ২য় প্রহরে যখন বিহাগ রাগ গাওয়া হয় তখন হইতেই শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়া যায়। ধীরে ধীরে তীব্র মধ্যমের অবলুপ্তি হইয়া যায় ও শুদ্ধ মধ্যমের প্রভাব বিস্তার হইতে থাকে এবং নিশা শেষে উষাকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগের প্রকাশ হইতে থাকে।

ভৈরব, কালিংড়া ইত্যাদি গাওয়া হয়। ইহার পর রামকলী ও ললিত রাগে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শুদ্ধ মধ্যমের প্রভাবই বেশী থাকে। তারপশ্চাতে যখন শুদ্ধ রে ও ধ যুক্ত রাগ গাহিবার সময় আসে তখনও শুদ্ধ মধ্যমেরই প্রাবল্য দেখা যায় যথা বিলাবল আদি। ইহার পর কোমল গ যুক্ত রাগ গাহিবার সময় হয় তখন দুই মধ্যমেরই প্রয়োগ দেখা যায়। কোন রাগে শুদ্ধ মধ্যম কোন রাগে তীব্র মধ্যম স্বরের প্রাধান্য দেখা যায়। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এরূপ চলিতে থাকে।

সূর্য্যাস্তের সময় যখন সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ গাওয়া আরম্ভ হয় তখন শুদ্ধ মধ্যমের অবলোপ ঘটে ও তীব্র মধ্যম প্রাধান্য লাভ করে, যথা, মারবা, শ্রী ইত্যাদি। ইহার পর শুদ্ধ রে ও গ যুক্ত রাগ আরম্ভ হয় যথা ইমন, হামীর, ইত্যাদি তীব্র মধ্যমেরই প্রাধান্য থাকে। ইহার পর কোমল গ যুক্ত রাগ যথা বাগেশ্বরী, কাফী ইত্যাদি রাগে পুনরায় শুদ্ধ মধ্যমই প্রাধান্য লাভ করে।

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে মধ্যম স্বরের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র মধ্যম স্বরের পরিবর্ত্তনেই রাগের স্থান নির্ণয় হইয়া যায়। যথা প্রাতঃকালের ভৈরব রাগ গাওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহৃত হয় যদি শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্ত্তে তীব্র মধ্যম ভৈরব রাগে ব্যবহার করা যায় ও প্রাতঃকালের বিলাবল রাগে শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্ত্তে তীব্র মধ্যম ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় কেবল মাত্র মধ্যমের ব্যতিক্রম হেতু, ভৈরবরাগ পুর্ব্বী ও বিলাবল, ইমন রাগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুর্ব্বী ও ইমন পুর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ। মধ্যমের পরিবর্ত্তন হেতু, রাগ, গায়নসময়, ঠাট, বাদী, সমবাদী, অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। সেজন্য ইহাকে "মধ্যমস্বরকে" অর্দ্ধদর্শক স্বর বলা হয়।

উত্তর ভারতীয় ও কর্ণাটকী তালের পার্থক্য

(১) হিন্দুস্থানী সংগীতে তাল অপেক্ষা রাগকে ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে রাগ অপেক্ষা তালকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে তালে "খালি" থাকে ও খালি বা ফাঁক চিহ্নটি "০" শূণ্য চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণী পদ্ধতি তালে ফাঁক বা খালি ব্যবহৃত হয় না।

(৩) উত্তর ভারতীয় তালের কোন জাতি নাই কিন্তু গুণ আছে যথা দুই, তিন, চার গুণ ইত্যাদি। দক্ষিণী তালের জাতি আছে। জাতি ৫ প্রকার, যথা, চতস্র, তিস্র, মিশ্র, খণ্ড ও সংকীর্ণ।

(৪) উত্তর ভারতীয় তাল লিখিবার সময় মাত্রা, ঠেকা ও ভাগ দ্বারা লিখিত হয়। দক্ষিণ পদ্ধতি তাল লিখিবার সময় লঘু দ্রুত আদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

(৫) উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে মুখ্যতাল বলিয়া কিছু উল্লেখ নাই, দক্ষিণ পদ্ধতিতে মুখ্য তাল ৭টি যথা, ধ্রুব, মঠ, রূপক, ঝম্পক, ত্রিপুট, অঠ ও এক।

॥ হিন্দুস্থানী রাগসংগীতে প্রযোজ্য নিয়মাবলী ॥

৩৬। তীব্র মধ্যম কখনও কোন রাগে বাদী বা সমবাদী প্রাপ্ত হয় না।

৩৭। নিষাদ কখনও কোন রাগের বাদীস্বর প্রাপ্ত হয়না।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

নজরুল ইস্‌লাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামের কাজী পরিবারে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে জন্মগ্রহণ করেন। কাজীরা মুস্‌লিম সমাজে মানভাজন লোক। নজরুলের পিতা ছিলেন ফকীর আহ্‌মদ এবং মাতা ছিলেন জাহেদা খাতুন্। কাজী ফকীর আহ্‌মদ নিঃস্ব অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই নজরুল প্রচণ্ড অভাব অনটনের সম্মুখীন হয়েছিলেন

আগেই উল্লেখ করেছি নজরুলের শৈশবকাল অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে এবং খুব অল্প বয়সেই তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। নজরুল সেই অতি শৈশব কালেই অর্থোপার্জ্জনের আশায় নানা ধরনের কাজ করতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। এই সময় তিনি লেটোর দলের গান বেঁধেছেন, রেলওয়ের গার্ড সাহেবের বাসায় চাকরী করেছেন। আবার আসানসোলের রুটির দোকানেও কাজ করেছেন। বাল্যকালেই তাঁর গ্রামের মক্তব হ'তে তিনি নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেছিলেন এবং শুধু স্বরচিহ্নের সাহায্যে অর্থ না বুঝে আরবী ভাষায় কুরআন পড়তে শিখেছিলেন।

১৯১৭ সালে তিনি রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। সামনেই ছিল তাঁর মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা। কিন্তু এই সময়ই তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে সৈন্যদলে নাম লেখালেন। এই ঘটনা থেকে হয়ত মনে হতে পারে যে তিনি পরীক্ষাকে এড়াবার জন্যই এ পথ নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সেই সময় দেশনেতারা সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্য বাঙ্গালী যুবকদের আহ্বান জানালেন এবং বহু ছাত্রই এই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। তিনি তাদের মতই একজন। সৈন্যদলে যোগ দেওয়াটা প্রকৃত দেশপ্রেমেরই লক্ষণ।

সৈনিক জীবনে তিনি ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের একজন হাবিলদার ছিলেন। সেই সময়ই তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। ১৯১৯ সনে তিনি প্রথম 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপানোর জন্য একটি কবিতা পাঠান এবং ঐ বছরই জুলাই আগস্ট মাসে উক্ত পত্রিকায় তাঁর 'মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি ছাপা হয়।

শিয়াড়শোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় একজন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ছিলেন। নজরুল তাঁর বৈপ্লবিক প্রেরণা এই শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯ নম্বর বেঙ্গলীরেজিমেণ্ট পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়। নজরুল ঐ মার্চ মাসেই কলকাতায় আসেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ক্রমশঃ সৈনিক নজরুল সাহিত্যিক নজরুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন।

নজরুলের বিভিন্ন রচনা কলকাতার প্রথম সারির পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকল, নজরুল কলকাতায় ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর গান। প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে তিনি গান গাইতেন, কেউ গান শুনতে চাইলে এবং তাঁর হাতে সময় থাকলে তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলের বাড়ীতেই আমন্ত্রিত হতেন এবং গান গাইতেন। তাঁর এই জনপ্রিয়তা সেই সময়কার একটি সামাজিক বাঁধও ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

নজরুল সবসময়েই ছিলেন দেশপ্রেমে ভরপুর। এই সময় তার বিভিন্ন রচনা বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাতের মত। ১৯২০ সালেই ১২ই জুলাই তারিখে কাজী নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্ফর আহ্মদের সম্পাদনায় 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নজরুলের লেখার গুণে প্রথমদিকেই কাগজটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে।

এরপর নজরুলের নিজের সম্পাদনায় ১৯২২ সালের ১২ই আগস্ট 'ধূমকেতু' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালেরই ২৬শে সেপ্টেম্বর উক্ত পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতাটির জন্য নজরুল গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯২৪ সালের ২৪ শে এপ্রিল প্রমীলা দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এই সব ঘটনাবহুল দিনগুলির মধ্যেই কবি সৃষ্টি করে চলেছিলেন তাঁর অসংখ্য গানের ও সুরের ডালি। কলকাতা তথা বাঙলার আকাশ বাতাশ মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর সুর সৌন্দর্য্যের ছোঁয়ায়।

নজরুল বরাবরই সংগীতচর্চা করে গেছেন। করাচীতে পল্টনের ব্যারাকেও তিনি সাহিত্য ও সংগীতের চর্চা করেছেন। তবে ১৯২৮ সালের শেষাশেষিতে নজরুল সংগীতের রাজ্যে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯২৮ সালেই তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছে আমন্ত্রিত হন এবং ট্রেনার রূপে যোগদান করেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময় আমি কলকাতার ছাত্র। আমার দেশ, ঢাকা বিক্রমপুর অধুনা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কবির লেখা বেশ কয়েকটি গান গাইতাম। এছাড়া কলকাতায় প্রায়ই উক্ত গ্রামোফোন কোম্পানীতে কবির ঘরে কবির সেই অপূর্ব সৌম্যমূর্তির পাশে গিয়ে বসে থাকতাম। সেই সময় কবির বিশেষ বন্ধু ও ছাত্র উমাপদ ভট্টাচার্য্য, অন্ধগোপাল সেন, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী চিত্ত রায় (যিনি পরবর্তীকালে আমার প্রতিষ্ঠিত সংগীত মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন) এবং আরও অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক নিয়মিত ভাবে ওখানে আসতেন ও কবির সাহচর্য্য কামনা করতেন। আজ আমি বিশেষ গর্বিত যে এই বিদ্রোহী কবির অনেক স্নেহ ও ভালবাসাই সেই ছাত্রাবস্থায় আমাকে সংগীত জীবনে প্রবেশ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল।

যতদূর জানা যায় ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান্ সাহেবের কাছে কবি উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। তাঁর নামে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন তারিখে গানের পুস্তক 'বন-গীতি' উৎসর্গ করেছেন এবং সেখানে লিখেছেন—"ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কলাবিদ্ আমার গানের ওস্তাদ জমিরুদ্দীন্ খান্ সাহেবের দস্ত্ মোবারকে"।

কবি প্রায় তিনহাজার গান রচনা করেছেন। এ এক অমূল্য সম্ভার। বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন ঢঙের সব গান কবি রচনা করেছেন। বহু বিদেশী শব্দকে বাংলা শব্দের সঙ্গে মিশিয়ে, নূতন নূতন ছন্দের বাঁধনে অপূর্ব সব গীত রচনা করেছেন তিনি।

সেই সময় বাংলাদেশের প্রায় সব সেরা কবিরাই গান রচনা করেছেন, এবং নিজেদের গানের সুর প্রায়ই নিজেরা দিয়ে গিয়েছেন। এই সময় বাংলাদেশের গান মোটামুটি ভাবে মার্গ সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এদিকে রবীন্দ্রনাথের সুরে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব যথেষ্ট পড়লেও মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট সংগীত জগতের বিশাল সুরের ছোঁয়া তাঁর রচনায় দেখতে পাইনা। নজরুলের গানের মধ্যে এই সংগীত জগৎ এক অসাধারণ সৌন্দর্য্য নিয়ে আবির্ভূত হ'ল। অবশ্য নজরুলের বিভিন্ন রচনায় গ্রামবাংলার নিজস্ব বহুসুরও যথেষ্ট স্থান পেয়েছে, মার্গসংগীতের যে ব্যবহার হয়েছে সে তো বলাই বাহুল্য। এসব কিছুর মধ্যে ঐ মধ্যপ্রাচ্যের সুর মানুষের কাছে একেবারে নূতন অভিজ্ঞতা, তাই তখন তাঁর প্রেমের (গজল্) গানের কলি অনেক মানুষের কণ্ঠেই ধ্বনিত হত।

নজরুলের সংগীতের ভাণ্ডার বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্যই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন অমূল্য সব রচনা। বৈষ্ণব, শাক্ত, হিন্দু, মুসলমান সকলেই তার মনের সুরের মূর্চ্ছনা শুনেছেন নজরুলের সুরের মধ্যে। এছাড়া প্রেমিকের জন্য যেমন লিখেছেন সুখ দুঃখের গান তেমনি হাসির গানের সংখ্যাও কম নয়। সবশেষে

তাঁর দেশাত্মবোধক গান তো আজও সমান ভাবে দেশের প্রতিটি মানুষের রক্তবিন্দুকে চঞ্চল করে তোলে।

সংগীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুলের অসামান্য দান। তিনিই প্রথম মার্চের সুরে গান রচনা করেন। যেমন—'চল্‌রে চল্‌রে চল্‌', টলমল টলমল পদ ভরে' ইত্যাদি। আগেই উল্লেখ করেছি রাগসংগীতেও নজরুলের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি নিজে কিছু রাগও সৃষ্টি করেছেন যেমন, —উদাসী ভৈরবী, অরুণ ভৈরবী, আশা ভৈরবী, সন্ধ্যা মালতী ইত্যাদি।

আবার ঐতিহ্যপূর্ণ রাগগুলির উপরও তাঁর অনেক রচনা আছে—

"অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী"— (আহিরভৈরব্)

"আজি নিঝুমরাতে কে বাঁশী বাজায়"— (দরবারী)

"তোমার হাতের সোনার রাখী"—(ভৈরব ঠুংরী)

"ফিরে গেছে সই এসে (নন্দকুমার)"—(ঠুংরী / দাদরা)

"আজ নূতন করে পড়লো মনে"—(টপ্পা)

"কে শিব শঙ্কর"—(ধ্রুপদাঙ্গ) ইত্যাদি।

আগেই উল্লেখ করেছি নজরুল তাঁর স্বদেশী সংগীতের মাধ্যমে চিরকালের যৌবনকে উত্তেজিত করেছেন। এই স্বদেশী সংগীতের মধ্যে আছে সামাজিক কুসংস্কার, রীতিনীতির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ, আছে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। তাই তাঁর রচনার মধ্যেও জলন্ত বিদ্রোহের বাণী।

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি গান খুব প্রচলিত। যেমন,

১। "জাতের নামে বজ্জাতি সব ...."

২। "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান ...."।

৩। "খড়ের প্রতিমা পুজিস্‌রে তোরা
মাকে তো তোরা পুজিস্‌নে"। ইত্যাদি।

অন্যদিকে স্বদেশীগানগুলির মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গানের নমুনা নীচে উল্লেখ করা হল। যেমন,

১। "এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল-পরা ছল্"।

২। "কারার ঐ লৌহকপাট"

৩। "দুর্গমগিরি কান্তার মরু"

৪। "ভাই হ'য়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান"।

৫। ওঠ্‌রে চাষী জগদ্বাসী (কৃষাণের গান)।

৬। ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল (শ্রমিকের গান)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নজরুলই প্রথম মধ্য প্রাচ্যের সুরকে ব্যবহার করেছেন। গজল্ পারস্য দেশীয় প্রেমের গান। নজরুল শুধু সুরই নয় বহু আরবী ও ফার্সী শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেছেন তাঁর রচনায়। যথা,

১। চ'ম্‌কে চ'ম্‌কে ভীরু ভীরু পায়। (আর্‌বী সুর)

২। ওই জল্‌কে চলে লো কা'র ঝিয়ারী। (গজল)

৩। আল্‌গা কর গো খোঁপার বাঁধন

দিল্ ওহি মেরা ফাঁস্ গ্যয়ি (বাংলা ও উর্দ্দুর মিশ্রণ ইত্যাদি)

এই শ্রেণীর অনেক গানই তিনি রচনা করেছেন। এবং এই শ্রেণীর গানগুলি খাম্বাজ, ভৈরবী, পিলু, মিঞাকি মল্লার, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগে হ'য়ে থাকে।

পারসী গজল ছাড়াও আরবী সুরের ওপর ধ্বনিপ্রধান গানও তিনি রচনা করেছেন —

"রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
খেজুর পাতায় নুপুর বাজায় কে যায়"।

নজরুল বাউল, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী, ঝুমুর, সাঁওতালী এমন কি কীর্ত্তনাঙ্গের গানও রচনা করেছেন। তাঁর এই ধরণের রচনায় প্রত্যেকটি ধারার নিজস্ব ঢং ও ভাব অক্ষুন্ন রেখেছেন—

বাউল —"মোর লীলাময় লীলা করে"

"আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল"

ভাটিয়ালী —"আমি ডাহিন জলের নদী"

সাঁওতালী—"হলুদ গাঁদার ফুল / রাঙা পলাশ ফুল"

কীর্ত্তন—"ওলো বিশাখা, ওলো ললিতে ইত্যাদি"

এছাড়াও কবি বহু ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে অর্থের অভাব, পুত্রশোক এবং নানাবিধ সাংসারিক অশান্তি কবিকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। শেষ জীবনে খুব বেশী রকম আধ্যাত্মবাদী হ'য়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী কবি। এই সময় তিনি কালী সাধনা করতেন। তাঁর এই সময়কার শাক্তগীতিগুলি অবিস্মরণীয়—

১। "ভারত শ্মশান হ'ল মা ..."

২। "জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্ মা ...."

৩। "সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে"

৪। "কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন"—ইত্যাদি।

এছাড়া তাঁর আগমনী গানগুলিও সুরের অপূর্ব সুষমায় সুষমামণ্ডিত।

বাংলার এই বিদ্রোহী কবি আকস্মিক ভাবে ৯ই জুলাই ১৯৪২ সালে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তারপর থেকেই প্রাণোচ্ছাসে ভরপুর বাংলার বুলবুলি ফুলের জলসায় নীরব কবিতে পরিণত হন। আমাদের সকলের দুর্ভাগ্য যে বহু চিকিৎসা করা সত্ত্বেও কবির বাহ্যিক চেতনা আর ফিরে আসেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সেখানকার প্রধান মুজিবর রহমান কবিকে ঢাকায় নিয়ে যান এবং সেখানকার নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মান জানান। তারপর নানারকম রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই প্রিয় কবি আর আমাদের দেশে ফিরে আসতে পারেননি। ঐ ঢাকা শহরেই ১৩৮৩ সালের ১৩ই ভাদ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



শুদ্ধিপত্র

পাতা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৬	৩৬" − ৫২" = ৪" + ৩ = ৩ × $\frac{২}{৩}$ = $\frac{৮}{৩}$; ৩৬" − $\frac{৮}{৩}$	৩৬" − ৩২" = ৪" + ৩ = $\frac{৪}{৩}$ × ২ = $\frac{৮}{৩}$; ৩৬" − $\frac{৮}{৩}$"
৩২	১৩	মারোয়া… …'…. ব্যবহৃত হয়	মারোয়া ……. ….ব্যবহৃত হয় যথা– ললিত
৩২	২৫	ভৈরব ঠাটের ……. …. ব্যবহৃত হয়	ভৈরব ঠাটের … ……. ব্যবহৃত হয় যথা— রামকেলি
৭৭	২	$\frac{ভুক}{১}$	$\frac{ভক}{২}$
২০৭	২৪	আছে ……… জনক ঠাট, শুদ্ধ ঠাট	আছে ……… জনক রাগ শুদ্ধ রাগ
২০৬	৬	ব্রহ্মতাল ২৮ মাত্রা = ।০।০০।০০০০	।০।০০।০০০